দু'টি সাক্ষী (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) এর অর্থ ও তাদের প্রত্যেকের জরুরী বিষয়।

সংকলন:মাননীয় শাইখ আল্লামাঅ◌াব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রাহমান ইবন জিবরীনআল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিরাপদে রাখুন।

ভূমিকা:

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি একাই পরিপূর্ণতার গুণে গুণান্বিত এবং বড়ত্বের গুণে তিনি একক। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সমকক্ষ ও সমতুল্য থেকে অনেক উর্ধ্বে। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল যিনি উত্তম বিশেষণে ব্যতিক্রম হওয়ার কারণে তাঁর রব তাকে সম্মান দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ হতে সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারের ওপর এবং তাঁর অনুগত-অনুসারী সাহাবীদের ওপর।

অতঃপর:

শাহাদাতের দুটি কালিমা উচ্চারণ করা এবং দুটির দাবি অনুযায়ী আমল করা যেহেতু দীন ইসলামের মৌলিক রুকন এবং অধিকাংশ লোক যেহেতু এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা বিশ্বাস করে যে, এ দ্বারা উদ্দেশ্য কোন প্রকার জানা ও আমল করা ছাড়া কেবল মুখে উচ্চারণ করা। আবার কেউ কেউ এমন আছে যে এ দুটির এমন ব্যাখ্যা করে যা তার অর্থের একেকারেই বিপরীত, তাই আমি এ ব্যাপারে একটি কিতাব লিখা ভালো মনে করলাম। এই আশায় যে, আল্লাহ যাদের কল্যাণ চেয়েছেন, তাদের থেকে যার ভালো উদ্দেশ্য রয়েছে সে এর দ্বারা উপকৃত হবে। কিতাবটি ছয়টি অনুচ্ছেদকে অর্ন্তভুক্ত করে। আর তা হলো:

প্রথম অধ্যায় : দু'টি সাক্ষীর ফযীলত সম্পর্কে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : দু'টি সাক্ষীর ওপর জিহাদ করা ও সাক্ষী দু'টি বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব।

তৃতীয় অধ্যায়: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বাক্যের অর্থ প্রসঙ্গে।

চতুর্থ অধ্যায় : মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল সাক্ষীর অর্থ প্রসঙ্গে।

পঞ্চম অধ্যায় : সাক্ষী দু'টির শর্তসমূহ।

ষষ্ঠ অধ্যায় : সাক্ষী (শাহাদাত) দু'টির ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ।

প্রথম অধ্যায় : দুটি সাক্ষীর ফযীলত সম্পর্কে।

হাদীছ ও সুন্নাহের কিতাবসমূহে একজন পাঠক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহ হতে অনেক অনেক বাণী পাবে যা এ দু'টি শাহাদাতের ফযীলতকে এবং যে বাস্তবায়ন করে তার জন্য জান্নাত, আল্লাহর সন্তুষ্টি, সফলতা এবং আল্লাহর আযাব ও তাঁর ক্রোধ থেকে নাজাতকে অর্ন্তভুক্ত করে। সে সব হাদীসসমূহ থেকে একটি হাদীস উবাদাহ বিন সামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দান করল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। এবং ঈসা আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, তিনি তাঁর এমন এক কালিমা যা তিনি মরিয়ামের প্রতি প্রেরণ করেছেন এবং তিনি তাঁরই পক্ষ থেকে প্রেরিত রুহ বা আত্মা। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে দাখিল করবেন। তার আমল যাই হোক না কেন।বুখারী ও মুসলিম। অন্য বর্ণনায় আছে,জান্নাতের আটটি দরজার যে দরজা দিয়ে সে জান্নাতে যেতে চাইবে,

আল্লাহ তাকে সেই দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু হিসাবে বর্ণিত:যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস সহকারে মৃত্যু বরণ করবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই, সে জান্নতে প্রবেশ করবে।আর আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, -যে কোনো বান্দা সন্দেহাতীতভাবে এই দু'টি বিষয়ের সাক্ষ্যদানকারী অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।উবাদাহ ইবন সামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার ওপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।আনাস ইবন মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয ইবন জাবালকে বলেছেন:যে বান্দা এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন।ইতবান ইবন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু এর দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে আল্লাহ তাআলা তার জন্যে জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন।উপরোক্ত হাদীসগুলো সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ বা তার যে কোনো একটিতে রয়েছে। কালেমা দু'টি বাস্তবায়ন করার ফযীলতের ব্যাপারে হাদীসগুলোর অর্থ সুস্পষ্ট। যেমন এর ওপর জান্নাতে প্রবেশ করা, জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া এবং জাহান্নাম হারাম করে দেয়া নির্ভর করে। আর এর ওপর জাহান্নাম থেকে পরিত্রান পাওয়াও নির্ভর করে। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,যে ব্যক্তি সকালে অথবা সন্ধ্যায় এই দুআ পাঠ করবে, اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وأنبياءك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك
"হে আল্লাহ্‌! তোমার নামে আমি সকাল করেছি। তোমাকে সাক্ষী রাখছি, তোমার আরশ বহন কারী ফেরেশতা, সকল নবী, ফেরেশতাকুল এবং তোমার সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সাক্ষী রেখে বলছি, নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ্‌, তুমি ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার বান্দা ও রাসূল, যে ব্যক্তি এটি পাঠ করবে, আল্লাহ তার একচতুর্থাংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। যে ব্যক্তি তা দু'বার পাঠ করবে, আল্লাহ তার অর্ধাংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ করবে, আল্লাহ তার তিন চতুর্থাংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন এবং যে ব্যক্তি তা চারবার পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে সম্পূর্ণরূপে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন"।ইমাম তিরমিযী ও আবু দাউদ হাদীসটি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। এই পবিত্র বাক্যের ফযীলতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, সমস্ত গুনাহের বিপরীতে এর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। বরং সমস্ত সৃষ্টির বিপরীতে তবে যাকে আল্লাহ চান তা ছাড়া। ইবনে হিব্বান ও হাকেম আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,মূসা আলাইহিস সালাম বলেন, "হে আমার রব! আমাকে এমন জিনিস শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করব এবং আপনাকে ডাকবো। তিনি বলেন, 'হে মূসা! তুমি لا إله إلا الله বল। তিনি বললেন, হে আমার রব, তোমার সব বান্দাই তো এটা বলে। অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তবে আমি এমন একটি বস্তু চেয়েছি যা দ্বারা তুমি আমাকে বিশেষায়িত করবে। তিনি বললেন, হে মূসা! সপ্তাকাশ এবং আমি ব্যতীত তাতে যা কিছু আছে তা আর সাত তবক যমীন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং আরেক পাল্লায় যদি শুধু لا إله إلا الله থাকে তাহলে لا إله إلا الله -এর পাল্লাই বেশী ভারী হবে।ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,নুহ আলাইহিস সালাম তাঁর পুত্রকে মরার সময় বলেছিলেন, আমি তোমাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার আদেশ দিচ্ছি। কেননা সাত আসমান ও সাত যমীন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং আরেক পাল্লায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হয়, তাহলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর পাল্লা ভারী হবে। সাত আসমান ও সাত যমীনকে যদি একদিকে রাখা হয় এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহকে আরেক দিকে রাখা হয়, তাহলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাকে পরাভূত করে ফেলবে।ইমাম তিরমিযী এবং অন্যান্য ইমাম আব্দুল্লাহ্‌ ইবন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে কাগজের টুকরা ওয়ালার হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাকে কিয়ামতের দিন ডাকা হবে।অতঃপর তার সামনে গুনাহের ৯৯টি রেজিষ্টার খোলা হবে। অতঃপর তার জন্য একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে। তাতে রয়েছে: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর রেজিষ্টারগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে এবং কাগজের টুকরটি অপর পাল্লায় রাখা হবে। তখন রেজিষ্টারগুলোর পাল্লা হালকা হবে এবং কাগজের টুকরাটির পাল্লা ভারী হবে।

প্রিয় পাঠক! আপনি দেখছেন যে, উপরোক্ত সহীহ হাদীসগুলো এই পবিত্র বাক্যটির ধারক ও বাহককে নাজাত ও সাফল্যের কথা জানিয়ে দিচ্ছে। তবে এটি বাস্তবায়ন করা এবং এর দাবি অনুযায়ী আমল করা জরুরী। এ সাধারণ ও শর্তহীন দলীলগুলো অন্যান্য ঐসব দলীলের সাথে মিলিয়ে বুঝতে হবে, যাতে সাক্ষ্য দু'টি উচ্চারণ করার সাথে

সাথে বান্দার মধ্যে ইখলাস বিদ্যমান থাকা, সত্যবাদী হওয়া...ইত্যাদি বিষয়ের শর্তারোপ করা হয়েছে। যাতে কালেমা দু'টির সাক্ষ্য বান্দার আমল ও আচরণে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : দু'টি সাক্ষীর ওপর জিহাদ করা ও সাক্ষী দু'টি বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,আমাকে মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা এ কথার স্বীকৃতি দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। যে বলবে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। সে আমার হাত থেকে তার জান-মাল নিরাপদ করে নিবে। তবে উক্ত দু'টি বিষয়ের সাক্ষীর অধিকার স্বরূপ তার ওপর কিছু আবশ্যক হলে সে কথা ভিন্ন। আর তার হিসাব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত থাকবে"। সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে,"যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই। আর যতক্ষণ না তারা আমার প্রতি এবং আমি যা নিয়ে এসেছি, তার প্রতি ঈমান আনয়ন না করবে"।ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"আমাকে লোকেদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে; যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর তাঁরা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত প্রদান করবে। যখন তারা এ কাজগুলো সম্পাদন করবে, তখন তারা আমার নিকট থেকে তাদের রক্ত (জান) এবং মাল বাঁচিয়ে নেবে; কিন্তু ইসলামের হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত হবে।"সহীহ বুখারীতে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের (মুশরিকদের) সাথে যুদ্ধ করার জন্য, যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তারা যখন এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, এবং আমাদের ন্যায় নামায আদায় করবে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করবে এবং আমাদের যবেহকৃত পশুর গোশত ভক্ষণ করবে তখন আমাদের ওপর তাদের জান-মাল হারাম হয়ে যাবে। তবে তাঁর অধিকার স্বরূপ (তাদের ওপর কিছু আবশ্যক) হলে, সে কথা ভিন্ন"।এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। এভাবেই যারাই উপরোক্ত দু'টি বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়ে ইসলাম কবুল করতো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে গ্রহণ করে নিতেন। আবু যার গিফরী রাযিয়াল্লাহু আনহু এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন,আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললাম, السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله অতঃপর আমি তাঁর চেহারা মোবারকে খুশির লক্ষণ দেখতে পেলাম।তাঁরা খালেদ ইবন ওয়ালীদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মদীনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমণ করলেন। তিনি বলেন,আমি তাঁকে সালাম দিয়ে বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই আর আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি তখন বললেন, আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি তোমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন।অনুরূপ খালেদ ইবন সাঈদ ইবন আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করেবললেন, আপনি কিসের দিকে আহবান করেন? তিনি বললেন, আমি এক আল্লাহর দিকে আহবান করছি যার কোনো শরীক নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। সেই সঙ্গে তুমি যে পাথরের এবাদত করছো, যে শুনে না, কারো ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না এবং কে তার এবাদত করছে আর কে করছে না, তাও জানে না, তার এবাদত বর্জন করার দাওয়াত দিচ্ছি। খালেদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।এ সব ঘটনা এবং আরো ঘটনা প্রমাণ করে যে, ইসলামে প্রবেশ করার জন্য শাহাদাত দুটি মুখে উচ্চারণ করা পূর্বশর্ত। যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দু'টি প্রদান করবে, সে এ দ্বীনে প্রবেশ করল। এর মাধ্যমে তার জান-মাল রক্ষা পাবে এবং তাকে হত্যা করা হারাম হবে। এই পবিত্র বাক্য পাঠ করার পরও উসামা ইবন যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন এক লাককে হত্যা করেছিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতিবাদ করেছেন। সহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এক যুদ্ধে পাঠালেন। তিনি বলেন,আমি এমন এক লোককে পেলাম, যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করছিল। আমি তাকে আঘাত করলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি তাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও হত্যা করেছো? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে অস্ত্রের ভয়ে তা পাঠ করেছে। তিনি বললেন, তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে?সহীহ বুখারীতে জুন্দুব আল-বাজালীর হাদীছে এসেছে,উসামা বলেছিল, হে আল্লাহর রাসূল! সে তো মুসলিমদেরকে কষ্ট দিয়েছে এবং অমুক অমুককে হত্যা করেছে। একারণেই আমি তার ওপর তলোয়ার উঠিয়েছি, তখন সে তলোয়ার দেখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বললেন, কিয়ামতের দিন যখন সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ নিয়ে উপস্থিত হবে, তখন তুমি কি করবে?ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীছে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন তাকে বলেছেন,সর্ব প্রথম যে জিনিষের দিকে তুমি তাদেরকে ডাকবে, তা হলো, একথার সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)এ অর্থে আরো অনেক হাদীছ রয়েছে, যা থেকে বুঝা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর যামানায় এদু'টি শাহাদাতকে যথেষ্ট মনে করতেন। সুতরাং, যে ব্যক্তি এদু'টি বিষয়ের সাক্ষ্য দিতো, এর অর্থ অনুযায়ী আমল করতো, প্রত্যেকটি বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের যে দাবি রয়েছে তা বাস্তবায়ন করতো এবং সকল শ্রেণীর এবাদত সম্পন্ন করতো, পবিত্র বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ বুঝে আল্লাহর তাওহীদ বাস্তবায়ন করতো, সমস্ত শির্কী আমল ও অভ্যাস বর্জন করতো এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, -এ কথার সাক্ষ্য দেয়া থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ করার আবশ্যকতা বুঝে নিতো, তাদেরকেই তিনি মুসলিম বলে গণ্য করতেন। কারণ তারা ছিল স্পষ্ট আরবী ভাষী। তারা কালিমায়ে শাহাদাতের অর্থ বুঝতো ও জানতো। 'ইলাহ' অর্থ কি তাও তারা জানতো। لا إله إلا الله এর মধ্যে বর্জন করা ও সাব্যস্ত করার যে অর্থ রয়েছে, তারা তাও বুঝতো। সুতরাং এ কালিমাকে তাদের মুখে বলানোর ওপরই তিনি যথেষ্ট মনে করতেন। কেননা, এ কালিমা উচ্চারণ করা দ্বারা নাজাত পাওয়া শর্ত হলো, এর অর্থ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে এর দাবি অনুপাতে আমল করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ "জেনে রেখো, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই"।সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ১৯আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,তবে যে হকের সাক্ষ্য দেয় অথচ তারা জানে।সূরা যুখরুফ: আয়াত : ৮৬

এরূপ আরো অনেক আয়াত যেগুলো প্রমাণ করে যে, তাঁর অর্থ জানা শর্ত। সুতরাং যেসব মুশরিক প্রকাশ্যভাবে দুই শাহাদাত উচ্চারণ করবে তাঁর থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এর মাধ্যমে সে তার জান নিরাপদ করে নিবে। এরপর তাকে পরীক্ষা করতে হবে এবং তার ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। সে যদি দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাওহীদকে বাস্তবায়ন করে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করে, তাহলে সে মুসলিম। তাঁর জন্য তাই রয়েছে যা অন্যান্য মুসলিমের জন্য রয়েছে। আর অন্যান্য মুসলিমদের ওপর যা আবশ্যক তার ওপরও তাই আবশ্যক। আর যদি সে যা সাক্ষ্য দিয়েছে তার বিপরীত আমল করে অথবা তার ওপর অর্পিত কোনো আমল অস্বীকার বশত বর্জন করে কিংবা দীনের সর্বজন বিধিত হারাম জিনিষগুলোকে হালাল মনে করে, তাহলে এই বাক্যটি তাকে রক্ষা করবে না।

বর্তমানকালের অনেক আলেম ও সাধারণ লোক, মূর্খ কিংবা মুকাল্লিদের মধ্যে এটিই লক্ষ্যণীয়, যে কারণে পরবর্তীকালের অনেক লোকের আকীদাহ বরবাদ হয়ে গেছে। তারা তাদের দীন ও শাহাদাতের বাক্য দু'টির অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়ে বড় হয়েছে। শুধু তাই নয়; তারা আরবী ভাষার অর্থ সম্পর্কেও অজ্ঞতা নিয়ে প্রতিপালিত হয়েছে। সুতরাং তাদের অধিকাংশই শাহাদাতের বাক্য দু'টির অর্থ বুঝে না। তাই তারা এর প্রকাশ্য বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। তারা এই বিশ্বাসে শাহাদাতের বাক্য দু'টি উচ্চারণ করাকেই যথেষ্ট মনে করে যে, অর্থ না বুঝে এবং তার দাবি অনুযায়ী আমল ব্যতীত তা আওড়ালেই ছাওয়াব পাওয়া যাবে এবং এর মাধ্যমে তাদের জান-মাল সংরক্ষিত থাকবে। এজন্যই যারা কালেমার অর্থের বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত হয় এবং তার উচ্চারণকে যথেষ্ট মনে করে আর ধারণা করে যে, এর মাধ্যমেই সে পূর্ণ তাওহীদের অধিকারী মুসলিম। তাদের উপর সুস্পষ্টভাবে দলীল-প্রমাণ সাব্যস্ত করার জন্যে এ দু'টি সাক্ষীর অর্থ বর্ণনা করা আমাদের জরুরি দায়িত্ব হিসেবে দেখা দিয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমার অর্থ প্রসঙ্গে:

কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ বর্ণনায় দাওয়াতের ইমামগণ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ একটি প্রশ্নের জবাবে আলাদা একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব লিখেছেন। তাঁর রচিত 'কাশফুশ শুভুহাত' নামক পুস্তিকা এবং অন্যান্য কিতাবে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কিতাবুত তাওহীদের ব্যাখ্যাকারীগণ ও অন্যান্য আলেম তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। শাইখ সুলায়মান ইবন আব্দুল্লাহ কিতাবুত তাওহীদের ব্যাখ্যা তাইসীরুল আযীযুল হামীদের ৫৩ নং পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছেন, তা আপনার সামনে তুলে ধরছি। তিনি বলেন, لا إله إلا الله অর্থ হলো, একমাত্র এক ইলাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আর তিনি হলেন আল্লাহ, যিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন। وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ "আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার

এবাদত করো”।সূরা আম্বীয়া: আয়াত : ২৫সাথে আল্লাহ তাআলার আরো একটি বাণী:وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ “আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত করো এবং পরিহার কর তাগূতকে”।সূরা নাহাল: আয়াত: ৩৬সুতরাং একথা নিশ্চিত হল যে, إله অর্থ মা‘বুদ। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কুরাইশদেরকে যখন বলেছিলেন,তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, তখন তারা বলেছিল, أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب “সে কি বহু মাবুদের বদলে এক মাবুদের এবাদত সাব্যস্ত করে দিয়েছে? নিশ্চয়ই এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার”! [সূরা সোয়াদ: ৫]আর হুদ সম্প্রদায়ের বলল,أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا “তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্য এসেছো যে, আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবো এবং আমাদের বাপ-দাদারা যাদের ইবাদত করে এসেছে তাদেরকে পরিহার করবো?”সূরা আরাফ: আয়াত : ৭০

সুতরাং তিনি তাদেরকে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর দিকেই আহবান করেছেন। আর এটিই হলো, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ। অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর এবাদত করা এবং তাঁকে ছাড়া অন্যের এবাদত বর্জন করা। আর তা হলো, তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। সুতরাং এ মহান বাক্যটি অর্ন্তভুক্ত করে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নয়। তিনি ছাড়া অন্য কারো ইলাহ হওয়া সম্পূর্ণ বাতিল এবং তা সাব্যস্ত করা সবচেয়ে বড় যুলুম। সুতরাং তিনি ছাড়া অন্য কেউ এবাদতের হকদার নয়। অনুরূপ তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইলাহ হওয়ার যোগ্য নয়। সুতরাং এটি তিনি ছাড়া অন্য কারো ইলাহ হওয়া নাকোচ করাকে এবং একমাত্র তাঁর জন্যই তা সাব্যস্ত করাকে অর্ন্তভুক্ত করে। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। এটি কেবল তাঁকেই একক ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করাকে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ না করাকে আবশ্যক করে। একজন সম্বোধিত ব্যক্তি এরূপ নেতিবাচক ও ইতিবাচক বাক্য থেকে এটিই বুঝে থাকে। যেমন, তুমি যখন দেখবে কেউ মুফতী হওয়ার অযোগ্য লোকের কাছে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করছে অথবা সাক্ষ্য দেয়ার যোগ্যতাহীন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিতে বলছে এবং যে যোগ্য তাকে বর্জন করছে, তখন তুমি বলবে যে, এই লোক তো মুফতী নয় কিংবা সাক্ষী নয়। মুফতী তো অমুক এবং সাক্ষী অমুক। বক্তার এ কথা এক দিকে আদেশ ও অপর দিকে নিষেধ।

ইবাদাতের সব প্রকার যা ভালোবাসা ও বিনয় দ্বারা অন্তর দিয়ে আল্লাহকে মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করা থেকে প্রকাশ পায় এবং তাঁর জন্য নত হওয়া দ্বারা প্রকাশ পায় যিনি একক তার কোন শরীক নেই, তা সবই উলুহিয়াতের মধ্যে শামিল। অতএব এবাদতে আল্লাহকে এক জানা আবশ্যক। যেমন, দু‘আ করা, ভয় করা, ভালোবাসা, ভরসা করা, প্রত্যাবর্তন করা, তাওবা করা, যবেহ করা, মান্নত করা, সিজদাহ করা। আর যাবতীয় সব ধরনের এবাদত তা একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে, যিনি একক তার কোন শরীক নেই। অতএব যেসব এবাদত একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সম্পন্ন করা সঠিক নয়, তা যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করে, সে মুশরিক। যদিও সে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠ করে। কেননা, কালিমাটি যে তাওহীদ ও ইখলাসের দাবি করে, সে অনুপাতে সে আমল করেনি।

‘ইলাহ’ এর অর্থ সম্পর্কে আলেমগণের বক্তব্য:

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহই তার সকল সৃষ্টির ওপর উলুহিয়াত ও উবুদিয়াতের অধিকারী। ইমাম ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতিম এটি বর্ণনা করেছেন।

উযীর আবুল মুযাফফার রাহিমাহুল্লাহ তাঁর ইফসাহ গ্রন্থে বলেন, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য দেয়ার দাবি হলো, সাক্ষ্যদাতা অবগত হবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,জেনে রেখো, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই।সূরা মুহাম্মাদ: আয়াত : ১৯সুতরাং ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠকারী তাতে সাক্ষ্যদানকারী হবে। আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট করেই বলেছেন যে, সত্যের সাক্ষ্যদাতা যদি সাক্ষ্যের বিষয় সম্পর্কে অবগত না হয়, তাহলে সে তা সত্যায়নে ঐ ব্যক্তির পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম হবে না, যে তা অবগত হয়ে সাক্ষ্য দেয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,“তবে যে ব্যক্তি অবগত হয়ে ও জেনে-বুঝে সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে তার কথা ভিন্ন”।সূরা যুখরুফ: আয়াত: ৮৬

إلا এর পরে আল্লাহ তাআলার নাম (اللَّهُ) পেশ বিশিষ্ট হবে। কেননা উলুহিয়াত একমাত্র তাঁর জন্যই হওয়া ওয়াজিব। তিনি ছাড়া অন্য কেউ উলুহিয়াতের হকদার হবে না। (উযীর আবুল মুযাফফার বলেন,) তা স্বীকার করার দাবি হলো, এটি জানা যে, যার মধ্যে পরিবর্তনের লক্ষণ বিদ্যমান, সে অবশ্যই ইলাহ হবে না। সুতরাং আপনি যখন বলবেন, لا إله إلا الله তখন আপনার এই কথার অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে, তা ইলাহ নয়। অতএব তোমার ওপর আবশ্যক হলো তাকে একক জানা। তিনি আরো বলেন, এ বিষয়ে উপকারিতার সারমর্ম হলো, তুমি জেনে নিবে যে, এই বাক্যটি তাগুতের প্রতি কুফুরী এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ওপর সামিল। কারণ, তুমি

যখন অন্যের উলুহিয়াত নাকোচ করলে এবং আল্লাহর জন্য উহা সাব্যস্ত করলে, তখন তুমি তার অর্ন্তভুক্ত হলে যে তাগুতকে অস্বীকার করল ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করল।

আবু আব্দুল্লাহ আল-কুরতুবী তাফসীরে বলেছেন, لا إله إلا هو অর্থ হলো তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।

যামাখশারী বলেন, الرجل (পুরুষ) এবং الفرس (ঘোড়া) ইত্যাদি শব্দের মতই الإله শব্দটি ইসমে জিনিস বা জাতিবাচক বিশেষ্য। হক কিংবা বাতিল সমস্ত মাবুদের ক্ষেত্রেই الإله শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে হক মাবুদের জন্যই শব্দটির ব্যবহার প্রাধান্য পেয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অনুসৃত মাবুদকেই ইলাহ বলা হয়।

لا إله إلا الله সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, এতে ইলাহ হিসেবে তার একা হওয়াকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। الإلهية শব্দটি তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান, কুদরাত, রহমত ও হিকমতকে অর্ন্তভুক্ত করে। অতএব এতে বান্দার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা যিনি ইলাহ তিনিই মাবুদ। আর মাবুদই এবাদত পাওয়ার হকদার। তিনি এবাদত পাওয়ার হকদার হওয়ার কারণ, তিনি এমন গুণাবলী দ্বারা বিশেষিত, যা তাকে পরম ভালোবাসার পাত্রে পরিণত ও চরম অনুসৃত সত্তার আসনে আসীন করেছে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সেই সত্তাই ইলাহ অন্তর যাকে ভালোবাসা, সম্মান, শরণাপন্ন হওয়া, সম্মান প্রদর্শন, বড়ত্ব প্রদান, বিনয়-নম্রতা, ভয়ভীতি ও আশা-ভরসায় আঁকড়ে ধরে।

ইবনে রজব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বড়ত্ব, সম্মান, ভালোবাসা, ভয় ও আশার সাথে যার ওপর ভরসা করে এবং যার নিকট প্রার্থনা ও যাকে আহ্বান করে যার আনুগত্য করা হয় কিন্তু নাফরমানী করা হয় না, তিনিই ইলাহ। এ বিষয়গুলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য খাটে নয়। অতএব যে কেউ উলুহিয়াতের এ বৈশিষ্টগুলোতে কোনো সৃষ্টিকে শরীক করবে, সেটা তার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার ইখলাসের ত্রুটি ও তার তাওহীদের ঘাটতি বিবেচিত হবে। আর এ ত্রুটি ও ঘাটতি অনুপাতে তার মধ্যে সৃষ্টির এবাদত বিদ্যমান থাকবে। এগুলো সবই শির্কের শাখা-প্রশাখা।

ইমাম বিকাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, لا إله إلا الله অর্থাৎ, মহান মালিক ছাড়া অন্য কারো জন্য সত্য মাবুদ হওয়া সম্পূর্ণরূপে নাকোচ হয়ে গেছে। কারণ, এ ইলমই হলো কিয়ামতের ভয়াবহতা হতে রক্ষাকারী মহা উপদেশ। ইলম তখনই প্রকৃত ইলম হয়, যখন তা উপকারী হয়। এটি তখনই উপকারী হয়, যখন বিশ্বাস ও আমল তার দাবি অনুযায়ী হয়। অন্যথায় তা শুধুই অজ্ঞতা।

ইমাম তিবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, فِعَال শব্দটি যেমন مفعول অর্থে এবং الكتاب শব্দটি المكتوب অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি الإله শব্দটির অর্থ المألوه হয়। أله إلهة অর্থ হলো عبد عبادة অর্থাৎ সে দাসত্ব করেছে। আলেমদের পরিভাষায় এরূপ ব্যবহার অহরহ। বস্তুত الإله অর্থ মাবুদ এটি আলেমদের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। কিন্তু কবরপূজারী এবং তাদের অনুরূপ অন্যরা الإله শব্দের অর্থের ব্যাপারে ভিন্ন আকীদাহ পোষণ করে। তারা বলে, الإله অর্থ সৃষ্টিকারী অথবা উদ্ভাবন করতে সক্ষম অথবা অনুরূপ অন্যান্য বাক্য। তারা মনে করে, এ অর্থে যদি তারা কালেমাটি বলে তাতে তারা চুড়ান্ত পর্যায়ের তাওহীদ বাস্তবায়ন করল। যদিও তারা গাইরুল্লাহর সকল প্রকার ইবাদত আঞ্জাম দেয়, যেমন মৃতদের ডাকা, বিপদাপদে তাদের নিকট ফরিয়াদ করা, প্রয়োজন পুরণে তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া, দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়ে তাদের জন্য মান্নত করা, আসমানসমূহ ও যমীনের রবের নিকট তাদের শাফাআত কামনা করা ইত্যাদি এবাদত। অথচ তারা জানে না যে, তাদের ভাই আরব কাফেরাও এ স্বীকারোক্তি প্রদানে তাদের বরাবর। তারাও জানতো যে, কেবল আল্লাহই স্রষ্টা, আবিষ্কারের ওপর ক্ষমতাশীল এবং তারা বিভিন্ন ইবাদত দ্বারা তাঁরই ইবাদত করত। অতএব কবরপূজারীদের বিধান মোতাবেক আবু জাহেল, আবু লাহাব এবং তাদের অনুসারীদেরও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া উচিত, অনুরূপভাবে তাদেরই ভাই (নূহ আলাইহিস সালামের গোত্রের মূর্তি) ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক এবং নাসরের এবাদতকারীদেরও ইসলামের স্বীয় ছায়াতলে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কারণ এরা তাদের দীনকেই গ্রহণযোগ্য ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে। যদি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ তাই হত এসব মূর্খরা যা ধারণা করেছে, তাহলে তাদের ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে কোনো দ্বন্ধ হতো না। বরং তারা কাল বিলম্ব না করে তাঁর ডাকে সাড়া দিতো এবং তাঁর আহবান কবুল করতো। যখন তিনি তাদেরকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতেন এ অর্থে যে, তার অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ সৃষ্টিতে সক্ষম নয়, তাহলে তারা বলতো, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আল্লাহ বলেন,ولئن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ "তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করো তোমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে? তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্"।সূরা যুখরুফ: আয়াত : ৮৭আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ "তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমান-যমীন কে সৃষ্টি করেছে? এরা বলবে, ঐগুলো মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী সত্তা সৃষ্টি

করেছেন”।সূরা যুখরুফ: আয়াত : ৯আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ “তুমি জিজ্ঞেস করো, কে রিযিক দান করে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে? কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক?সূরা ইউনুস: আয়াত : ৩১আয়াতটি, এরকম আরো অনেক আয়াত রয়েছে।কিন্তু লোকেরা ছিল আরবী ভাষার অধিকারী। ফলে তারা বুঝতে পেরেছিল যে, لا إله إلا الله মৃত ও মূর্তিদেরকে আহব্বান করাকে মুল থেকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়, আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে শাফাআত চাওয়া ও তিনি ছাড়া অন্যের জন্য ইলাহ সাব্যস্ত করার প্রাচীর উল্টিয়ে ফেলে। তাই তাঁরা বলেছিল,مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى “এদের এবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়”।সূরা যুমার: আয়াত : ৩(তারা আরো বলেছিল,) هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ “এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী”।সূরা ইউনূস: আয়াত : ১৮(তারা আরো বলেছিল,) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ “সে কি বহু মাবুদকে এক মাবুদে পরিণত করে দিয়েছে? নিশ্চয়ই এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার!”সূরা সোয়াদ: আয়াত: ৫সুতরাং আফসোস ঐসব লোকের জন্য, যাদের চেয়ে কুরাইশ বংশের কাফের নেতা এবং অন্যান্য কাফের ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ছিলো। আল্লাহ তাআলা বলেন,إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ “তাদের যখন বলা হতো, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, তখন তারা দাম্ভিকতা প্রদর্শন করতো এবং বলতো, আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব?সূরা সাফ্‌ফাত: ৩৫-৩৬সুতরাং তারা বুঝতে পেরেছিল যে, এটির দাবি হলো আল্লাহ ছাড়া অন্যের এবাদত বর্জন করা, ইবাদতে আল্লাহকে একক জানা। আর কবরপূজারীদের অবস্থাও তাদের অনুরূপ যখন তুমি তাদের কাছে আল্লাহকে খালেসভাবে ডাকা এবং এবাদত কেবল এক আল্লাহর জন্য করার আবেদন করবে, তখন তারা বলবে, আমরা কি প্রয়োজন পূরণ করার জন্য আমাদের নেতা ও সুপারিশকারীদের আহবান করা ছেড়ে দিবো? তাদের বলা হবে যে, হ্যাঁ, এদেরকে বর্জন করা এবং ইখলাস অবলম্বন করাই হলো সত্য-সঠিক। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ “অথচ তিনি সত্য নিয়ে এসেছেন এবং রাসূলদেরকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন”।সূরা আস্ সাফফাত: আয়াত : ৩৭সুতরাং لا إله إلا الله নাফী ও ইছ্বাত তথা নাকোচ করা ও সাব্যস্ত করার অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে।আল্লাহ ছাড়া বাকিসবের ইলাহ হওয়া নাকোচ করে। সুতরাং তিনি ছাড়া অন্য সব যেমন ফেরেশতা ও নবীগণ ইলাহ নয়, অন্যরা তো নই। কারো জন্যই এবাদতের কোনো অংশ নেই।

এটি ইলাহ হওয়া একক আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ বান্দা তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বানাবে না। অর্থাৎ কোনো এবাদতে তাঁকে ছাড়া কাউকে উদ্দেশ্যে করবে না। আর তা হলো, অন্তরকে এমন সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করা যাকে বিভিন্ন ধরণের ইবাদতের মাধ্যমে ইচ্ছা করা হয়, যেমন, দু‘আ, যবেহ, মান্নত ইত্যাদি।

মোট কথা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বানানো যাবে না। অর্থাৎ তাঁকে ছাড়া কারো এবাদত করা যাবে না। যে ব্যক্তি এই কালেমাটির অর্থ জেনে তার দাবি অনুযায়ী আমলকারী হয়ে বলবে, শির্ক বর্জন করা, একত্ববাদকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা, সেই সঙ্গে তার অর্থের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করবে ও সে অনুযায়ী আমল করবে সেই প্রকৃত মুসলিম। যদি তার দাবি অনুযায়ী বিশ্বাস করা ছাড়া বাহ্যিকভাবে আমল করে, সে মুনাফিক। আর যদি তার বিপরীত আমল শির্ক করে, তাহলে সে কাফের। যদিও সে মুখে তা বলে। আপনি কি জানেন না যে, মুনাফিকরা বাহ্যিকভাবে তার ওপর আমল করে। অথচ তারা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্থানে থাকবে? ইহুদীরা শির্ক ও কুফুরীর উপর বিদ্যমান থেকেও এটি বলে। তাই এটি তাদের কোনো উপকার করবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি এর দাবি ও হকসমূহ থেকে কোনো একটি অস্বীকার করার মাধ্যমে ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যায়, তা তার কোনো উপকার করবে না। যদিও সে একলক্ষবার তা বলে। অনুরূপভাবে যে ইবাদতের কোন প্রকার ইবাদত গাইরুল্লাহর জন্য সমর্পণ করে যেমন কবর ও মূর্তি পুজা করা তা তাদের কোনো উপকার করবে না। তা বলার ফযীলত বিষয়ে যে সব হাদীস এসেছে এবং তার অনুরূপ আরো যত হাদীস রয়েছে, তাতেও তারা অন্তর্ভুক্ত হবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম لا إله إلا الله وحده وشريك له এর সাথে বলে এটিই বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি সতর্ক করেছেন যে, মানুষ কখনো তা বলে অথচ সে মুশরিক। যেমন ইয়াহুদী, মুনাফিক ও কবরপূজারীরা। কবর পূজারীরা যখন দেখলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গোত্রের লোকদেরকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার আহবান জানাচ্ছেন, তখন তারা মনে করলো, তিনি শুধু এটি উচ্চারণ করার জন্যই তাদেরকে ডাকছেন। এটি তাদের বিরাট মূর্খতা। বরং তিনি তাদেরকে তার প্রতি আহ্বান করেছেন, যাতে তারা এটি বলে এবং অর্থ অনুযায়ী আমল করে এবং গাইরুল্লাহর এবাদত বর্জন করে। তাই তারা বলেছিল,أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ “আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব?সূরা আস্ সাফ্‌ফাত: আয়াত: ৩৬তারা আরো বলেছিল,أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً “সে কি বহু মাবুদকে এক মাবুদ বানিয়ে ফেলেছে?সূরা সোয়াদ: আয়াত: ৫এজন্যই তারা তা মুখে বলতে অস্বীকার করেছিল। অন্যথায় তারা যদি এটি বলতো এবং লাত, মানাত ও উয্যার এবাদতের ওপর বাকী থাকতো, তাহলে তারা মুসলিম হতো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন যতক্ষণ না তারা তাদের শরীকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতো এবং তাদের এবাদত বর্জন করে এক আল্লাহ

যার কোন শরীক নেই তার এবাদত করতো। এটি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা থেকে বাধ্যতামুলক ভাবে জানা বিষয়। কিন্তু কবরপূজারীরা এ কালেমাটির অর্থ জানে না। তারা গাইরুল্লাহ থেকে ইলাহিয়াত নাকোচ করা এবং একমাত্র তাঁর জন্যই সাব্যস্ত ইলিয়াতের মর্মার্থ বুঝতে পারেনি, যিনি একক তার কোনো শরীক নেই। বরং এ থেকে তারা শুধু তাই বুঝেছে, যা মুসলিম ও কাফের সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে এবং সমস্ত সৃষ্টি الإله শব্দের এপরিমাণ অর্থের ওপর একমত যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না অথবা الإله অর্থ হলো যিনি সবকিছু থেকে অমূখাপেক্ষী এবং সবকিছু তাঁর প্রতি মূখাপেক্ষী। এ জাতীয় আরো অর্থ। এই অর্থ সঠিক ও ইলাহ হওয়ার জন্য এই ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। তবে لا إله إلا الله দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য নয়। কেননা এ পরিমাণ অর্থ কাফেররাও বুঝতে পেরেছিল এবং তার স্বীকৃতিও দিয়েছিল। তারা এবিশ্বাস করতো না যে, তাদের মাবুদদের মধ্যে উপরোক্ত কোনো বৈশিষ্ট রয়েছে। বরং তারা তাদের মাবুদসমূহের অক্ষমতা, অসহাত্ব এবং মহান আল্লাহর প্রতি তাদের প্রয়োজনের কথা স্বীকার করতো। তারা কেবল এটি মনে করেই তাদের এবাদত করতো যে, এরা হলো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কাম্যবস্তু হাসিল করার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী ও আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী মাত্র। অন্যথায় তারা মেনে নিয়েছিল যে, সৃষ্টি করা, কর্তৃত্ব করা, রিযিক দেয়া, জীবন দেয়া, মৃত্যু দান করাসহ সবকিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ জানতো, তবে তারা কালিমাটি মুখে উচ্চারণ করতে ও সে অনুযায়ী আমল করে অস্বীকার করেছে। তাই উলুহিয়াতের মধ্যে শির্ক থাকার কারণে তাওহীদুর রুবুবীয়াহ তাদের কোনো উপকার করেনি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ "অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন করে, কিন্তু সাথে সাথে শির্কও করে"।সূরা ইউসুফ: আয়াত: ১০৬

কবর পুজারীরা তা মুখে বলে কিন্তু তার অর্থ জানে না এবং তারা এর অর্থ বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করেছে। ফলে তারা ঐসব ইহুদীর মতোই, যারা এটি পাঠ করে; কিন্তু এর অর্থ জানে না এবং সে অনুযায়ী আমলও করে না। ফলে তুমি তাদের কাউকে দেখতে পাবে যে, সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে অথচ সে গায়রুল্লাহকে মুহাব্বাত, সম্মান, মর্যাদা, ভয়, আশা, ভরসার সাথে ডাকে এবং বিপদাপদে দু'আ দ্বারা তার শরণাপন্ন হয়। এবং অন্তরের ভালোবাসা থেকে প্রকাশ পাওয়া বিভিন্ন প্রকার এবাদত দ্বারা তাকেই উদ্দেশ্য করে। এটি প্রথম যুগের মুশরিকদের কাজ-কর্মের চেয়েও অধিক ভয়াবহ।

এজন্যই আপনি যখন তাদের কাউকে আল্লাহ তাআলার নামে কসম করতে বলবেন, তখন সে আপনার ইচ্ছামত কসম করবে। সত্য-মিথ্যার কোনো তোয়াক্কা করবে না। আর যদি বলা হয়, অমুক শাইখের জীবনের কসম করো অথবা অমুক শাইখের কবরের কসম করো অথবা এরকম অন্য কিছুর কসম করো তখন এ ক্ষেত্রে সে মিথ্যা কসম করবে না। এর কারণ হলো মাটির নিচে দাফনকৃত ব্যক্তি তার নিকট সব রবের যিনি রব তার চেয়েও অধিক মর্যাদাবান। পূর্বযুগের মুশরিকরা এরূপ ছিল না। বরং তারা যখন সুদৃঢ় কসম করার ইচ্ছা করতো, তখন আল্লাহ তাআলার কসমই করতো। যেমন কাসামার ঘটনা যা জাহেলী যুগে সংঘটিত হয়েছিল। ঘটনাটি সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে।

কবরপূজারীদের অনেকেই অথবা অধিকাংশ লোকই মনে করে, কবরের কাছে বা অন্যান্য স্থানে অলীদের নিকট ফরিয়াদ করা মসজিদে গিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট ফরিয়াদ করার চেয়ে অধিক উপকারী। তারা প্রকাশ্যেই একথা বলে থাকে। তাদের থেকে এজাতিয় অনেক দীর্ঘ কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এটি এমন শির্ক, যা পূর্ববর্তীদের শির্কের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কেননা এসব কবরপূজারী বিপদাপদে আক্রান্ত হলে মাটির নিচে দাফনকৃত লোকদের নিকট একনিষ্ঠভাবে ফরিয়াদ করে এবং বিপদাপদ দূর করার জন্য তাদেরকে নাম ধরে ডাকাডাকি করে জল ও স্থলে এবং পথে ভ্রমণ করার সময় ও ভ্রমণ থেকে ফিরে আসার সময়। এটি এমন শির্ক, যা পূর্বকালের মুশরিকরাও করেনি। বরং পূর্বকালের মুশরিকরা এমন অবস্থায় সুমহান ও সর্বোচ্চ আল্লাহর কাছেই ফরিয়াদ করতো। আল্লাহ তাআলা বলেন,فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ "তারা যখন জলযানে আরোহন করে, তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকেই ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শির্ক করতে থাকে"।সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৬৫এবং তার বাণীঅতঃপর দুঃখ-দুর্দশা যখন তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা শুধু তার কাছেই ফরিয়াদ কর। তারপর যখন তিনি তোমাদের থেকে দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দেন, তখন তোমাদের মধ্য থেকে একটি দল তাদের রবের সাথে শির্ক করে।সূরা নাহল, আয়াত: ৫৩-৫৪

তাদের অনেকেই মসজিদগুলোকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে কবর ও সমাধিগুলো আবাদ করতে শুরু করেছে। কবরপূজারীদের কেউ কেউ তার সম্মানিত কবরের নিকট গিয়ে কবরবাসীর নিকট এমন ভীত, অনুগত, ও বিনীত হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে, যে অবস্থা জুমআ, জামআত, তাহাজ্জুদের সালাত ও ফরয সালাত শেষেও হাসিল হয় না। তারা কবরবাসীদের নিকট গুনাহ মা'ফের আবেদন করে, বিপদাপদ দূর করার ফরিয়াদ করে,

জাহান্নাম থেকে মুক্তি চায় এবং তাদের থেকে পাপের বোঝা সরিয়ে ফেলার জন্য দুআ করে। সুতরাং আলেম তো দূরের কথা, সাধারণ বিবেকবান লোক কিভাবে ধারণা করতে পারে যে, এসব কাজ করার পরও لاإله إلا الله তাদের উপকার করবে? তারা তাদের জবান দিয়ে পবিত্র কালেমাটি উচ্চারণ করেছে মাত্র কিন্তু তারা আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের মাধ্যমে তার বিরোধীতা করেছে। কোনো সন্দেহ নেই যে, কোনো মুশরিক যদি 'ইলাহ' এর অর্থ না জেনেই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, 'রাসূল' এর অর্থ না বুঝেই সাক্ষ্য দেয় যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং সালাত আদায় করে, সিয়াম রাখে হজ্জ করে, কিন্তু এগুলোর অর্থ সে জানে না, শুধু মানুষকে এগুলো করতে দেখে তাদের অনুসরণ করে, কোনো প্রকার শির্কেও লিপ্ত হয়না, তাহলে সে মুসলিম না হওয়ার ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। হিজরী এগারো শতকের প্রথম দিকে অথবা তারও পূর্বে মুসলিম বিশ্বের পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত আলেম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারী এমন এক ব্যক্তির মুসলিম না হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন, যে উক্ত কাজগুলোতে লিপ্ত ছিল। মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম الدر الثمين في شرح المرشد المعين (দুররুছ ছামীন ফী শারহিল মুরশিদ আল-মুঈন) গ্রন্থের লেখক ফতোয়াটি এভাবেই উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তার ব্যাখ্যাকার বলেছেন, তাদের এফতোয়াটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এতে দু'জনের দ্বিমত পোষণ করার কোনো সুযোগ নেই। দুররুছ ছামীন গ্রন্থকারের উক্তি এখানেই শেষ।

নিঃসন্দেহে কবরপূজা এর চেয়ে ভয়াবহ। কেননা, তারা বিভিন্ন প্রভুর মধ্যে ইলাহ হওয়ার যোগ্যতাকে বিশ্বাস করে।

যদি বলা হয়, ইলাহ এবং উলুহিয়াতের অর্থ স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং, যে বলে, 'ইলাহ' হলো যিনি সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন এবং এ ধরনের কথা? তার জবাব কী হবে?বলা হবে,জবাব দুইভাবে:এক:এটি একটি বিদআতী কথা। কোনো আলেম কিংবা আরবী ভাষাবিদ একথা বলেননি। ইলাহ সম্পর্কে আলেম ও ভাষাবিদ ইমামগণ যা বলেছেন তাই এর প্রকৃত অর্থ, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট বাতিল।দ্বিতীয়:তারা 'ইলাহ' এর যে ব্যাখ্যা করেছে, তা মেনে নেয়া হলে তাদের কথাকে এঅর্থে সমর্থন করা যেতে পারে যে, সত্য ইলাহ এর জন্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। সত্য মাবুদের জন্য আবশ্যক হলো তিনি সৃষ্টিকারী হবেন এবং উদ্ভাবন করার ক্ষমতা রাখবেন। এরূপ না হলে তিনি সত্য ইলাহ নন। যদিও তাকে ইলাহ বা মাবুদ বলে নামকরণ করা হয়ে থাকে। তাওহীদের বাক্য লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ এর উদ্দেশ্য এটি নয় যে, কেউ যদি জানতে পারে যে, ইলাহ অর্থ হলো সৃষ্টিকারী তাতেই সে মুসলিম হয়ে যাবে, কালেমার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকারী হিসাবে গণ্য হবে এবং জান্নাতের চাবি পেয়ে সফলকাম হয়ে যাবে। কোনো আলেম একথা বলেননি। ইলাহ' এর উদ্দেশ্য এটি হলে আরবদের কাফেরদেরকেও মুসলিম হিসাবে গণ্য করা আবশ্যক হবে। পরবর্তীদের যারা ইলাহ দ্বারা সৃষ্টিকর্তা উদ্দেশ্য করেছে, তারা ভুলের মধ্যে রয়েছে। কুরআন, সুন্নাহ এবং বুদ্ধিভিত্তিক দলীল দিয়ে তাদের প্রতিবাদ করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়: (মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল) সাক্ষীর অর্থ সম্পর্কে।

তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য একসঙ্গে উচ্চারণ করার নাম যেহেতু شهادة এবং তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য যেহেতু পরস্পর এমনভাবে সংযুক্ত যে, একটি অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, তাই যে ব্যক্তি উল্লেখিত দু'টি সাক্ষ্য দিবে তার উপর শাহাদাত শব্দটির অর্থ জানা আবশ্যক, এর মর্মার্থকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং জীবনে ও চলার পথে তা বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব। প্রিয় পাঠক আপনি যখন জানলেন যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা শুধু জবানের উচ্চারণ উদ্দেশ্য নয়, তখন উহার সঙ্গে যুক্ত বাক্য (মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল) এর ব্যাপারেও অনুরূপ কথা প্রযোজ্য। বরং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল বিশ্বাস করা এবং তার অর্থ ও দাবিকে আঁকড়ে ধরা জরুরি। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, তিনি তাঁর মহান প্রভুর পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছেন। ইসলামী শরীয়তকে রেসালাত হিসাবে তাঁর উপর অর্পন করেছেন এবং উম্মতের নিকট তা পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব সোপর্দ করেছেন। সেই সঙ্গে সমস্ত জাতির উপর তাঁর রেসালাত কবুল করে নেয়া ও তাঁর পথে চলা আবশ্যক করেছেন। এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে কয়েকটি বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে তাঁর অনুসরণ করা, যথাযথভাবে রেসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা এবং এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে। বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

প্রথম বিষয়:এই রেসালাতের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই উপযুক্ত হওয়া।আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,আর তোমার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং মনোনীত করেন।সূরা কাসাস, আয়াত: ৬৮আল্লাহ তা'আলা

বলেছেন,“আল্লাহ্ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় রেসালাত প্রেরণ করতে হবে”।সূরা আনআম, আয়াত: ১২৪আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,“নিশ্চয়ই তারা ছিল আমার মনোনিত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত”।সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৪৭

এ ধরণের অন্যান্য আয়াতসমূহ যা আমাদের জানাচ্ছে যে, আল্লাহর রাসূলগণ মানুষ জাতির অন্তর্ভূক্ত, যাদেরক আল্লাহ তাআলা মর্যাদাবান, মনোনীত ও পবিত্র করেছেন, ফলে তারা তার রেসালাত বহন করার উপযুক্ত হয়েছেন। আর তার শরীয়ত ও দীনের জন্য বিশ্বস্ত এবং তার মাঝে ও তাঁর বান্দাদের মধ্যস্থতাকারী হয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা কতিপয় জাতির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা তাদের রাসূলগণকে মিথ্যুক বলেছিল। তারা তাদের রাসূলগণকে বলেছিল,إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا “তোমরা তো কেবল আমাদের মতোই মানুষ”।সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ১০তখন রাসূলদের জবাব ছিল তারা বলল,إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ “আমরা তোমাদের মতো মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার ওপর অনুগ্রহ করেন”।সূরা ইবরাহীম: আয়াত: ১১আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু সর্বশেষ ও সর্বোত্তম নবী, আর আল্লাহ তাঁকে এমন কিছু দ্বারা বিশেষিত করেছেন যা তাঁর পূর্বে অন্য কারো জন্য হাসিল হয়নি, তাই নিঃসন্দেহে তিনি এই বিশেষ মনোনয়ন ও নির্বাচনের বড় অংশীদার, যার কারণে তিনি সমগ্র মাখলুক জিন ওইনসানের নিকট প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে বলেন,وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ “নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উপর রয়েছো”।সূরা কালাম, আয়াত: ৪সহীহ মুসলিমে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,كان خلقه القرآن “তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন”।অর্থাৎ কুরআনের মধ্যে যেসব মহান চারিত্রিক গুণাবলী ও সর্বোত্তম আমল রয়েছে এবং যার সৌন্দর্য ও যথার্থতার ব্যাপারে প্রত্যেক বিবেকবান সাক্ষ্য প্রদান করেন, তিনি তা বাস্তবায়ন করতেন। তাঁর উপর অহী নাযিল হওয়ার আগেও তিনি বিশ্বস্থতা, সত্যবাদিতা, ওয়াদা-অঙ্গীকার রক্ষা করা চারিত্রিক পবিত্রতাসহ অন্যান্য উন্নত গুণের বিরাট অংশের অধিকারী ছিলেন, যে কারণে মক্কার লোকেরা তাকে الصادق الأمين বা সত্যবাদি বিশ্বস্ত বলেই জানত। নবুওয়াতের পরে উক্ত চারিত্রিক গুণাবলী তাঁর মধ্যে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সুদৃঢ় হয়েছে। তিনি ভদ্রতা, বদান্যতা, সহনশীলতা, ধৈর্যশীলতা, মানবতা, কৃতজ্ঞতা, ন্যায়পরায়নতা, চারিত্রিক পবিত্রতা, বিনয়-নম্রতা, বীরত্ব এবং অনুরূপ অন্যান্য উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা অলংকৃত ছিলেন। সীরাতে নববী ও ইতিহাসের কিতাবগুলোতে তাঁর এই উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর অনেক দৃষ্টান্ত লিখিত রয়েছে। দৃশ্যমান জিনিসের অস্থিত্ব অস্বীকারকারী ব্যতীত কেউ তাঁর মহান চারিত্রিক গুণাবলীতে মতভেদ করতে পারে না।

অনুরূপ তিনি কৃপণতা, লোভ, যুলুম, অত্যাচার, অহংকার, মিথ্যাবাদিতা, কাপুরুষতা, অপারগতা, অলসতা, চুরি এবং বিশ্বাসঘাতকতাসহ অন্যান্য ঐসব দোষ-ত্রুটি এবং নিকৃষ্ট স্বভাব থেকে মুক্ত ছিলেন, যা মানুষের ভারত্ব নষ্ট করে ফেলে, মানবতা দূর করে দেয় এবং যাতে বিশেষিত মানুষ ঘৃণ্য ও নিকৃষ্টে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় বিষয়:ভুল-ত্রুটি থেকে তার নিষ্পাপ হওয়া:

উম্মত একমত যে, নবীগণ কবীরা গুনাহ থেকে মা'সুম ও মুক্ত। কেননা কবীরা গুনাহ নবুওয়াতের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পরিপন্থি। অধিকন্তু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাঁর রেসালাতের দায়িত্ব দিয়ে মানব জাতির নিকট পাঠিয়েছেন। তাই তাদের জন্য জাতির সামনে আদর্শ হওয়া আবশ্যক। সেই সঙ্গে তিনি তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন তারা যেন মানুষকে কুফুরী, গুনাহ, আনুগত্যহীনতা ও পাপাচার থেকে সতর্ক করেন। যদি তাদের থেকে এসব অন্যায় ও পাপাচার প্রকাশিত হয়, তাহলে শত্রুরা তাদের দোষ-ত্রুটি ধরার সুযোগ পেয়ে যেতো এবং তাদের শরীয়তকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অযুহাত পেতো। আর এটি আল্লাহর হেকমতের বিপরীত। তাই আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহমতে তাদেরকে এসব অন্যায় আচরণ থেকে হেফাযত করেছেন এবং তা থেকে মানুষকে নিষেধ করা ও এর ভয়াবহ পরিণতির কথা বর্ণনা করার দায়িত্ব তাদেরকে দিয়েছেন। যেমন তাদেরকে এবাদত গোজার ও আখেরাত অভিমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে আদর্শ বানিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের ঐসব উপকরণ সংগ্রহ করার আগ্রহ কমিয়ে দিয়েছেন, যা মানুষকে আখেরাতের সুখ-শান্তি লাভের জন্য আমল করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। তবে সগীরা গুনাহর ব্যাপারে কথা হলো, নবীদের কারো থেকে তা কখনো নিজস্ব ইজতেহাদ করার কারণে হতে পারে। কিন্তু তাদেরকে এতে বহাল রাখা হয় না। তাই নবীদের দ্বারা কখনো কখনো সগীরা গুনাহ হলে তা তাদের ন্যায়পরায়নতাকে নষ্ট করে দেয় না এবং এটি নবুওয়াতের মর্যাদার পরিপন্থিও নয়। এটি শুধু একারণে হয় যে, তারাও মানুষ এবং এটি দেখানোর জন্য যে, তাদের কেউ ইলমুল গায়েবের সীমায় পৌঁছতে পারেনি ও তাদের কাউকে প্রভুত্বের কোনো বিশেষণ দেয়া সঠিক নয়।

মুফাসসির এবং আলেমগণ কতক সংঘটিত বিষয় উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআালা বাণী,আর তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না তাদেরকে, যারা নিজ রবকে সকাল সন্ধ্যায় ডাকে, তারা তার সন্তুষ্টি চায়।সূরা আনআম, আয়াত: ৫২এবং তার বাণীআমি তোমাকে যে ওহী দিয়েছি, তা থেকে তারা তোমাকে প্রায় ফিতনায় ফেলে

দিয়েছিল, যাতে তুমি আমার নামে এর বিপরীত মিথ্যা রটাতে পার এবং তখন তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। আর আমি যদি তোমাকে অবিচল না রাখতাম, তবে অবশ্যই তুমি তাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়তে।সূরা ইসরা, আয়াত: ৭৩-৭৪

এ ধরণের যে সব ঘটনা তিনি স্বীয় ইজতিহাদ অনুযায়ী বাহ্যিক কল্যাণের আশায় করেছেন, আল্লাহ জানেন যে তা হাসিল হবে না।

আর পাপাচার ও কবীরা গুনাহর ক্ষেত্রে কথা হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাতে লিপ্ত হওয়া থেকে ও তা সমর্থন করা হতে বাচিয়ে রেখেছেন। কেননা তা রেসালাত ও (আল্লাহর) মনোনীত হওয়ার বিপরীত এবং তার নিজের থেকে কুফুর, অপকর্ম ও অবাধ্যতা থেকে যে সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে তারও বিপরীত। তবে তার নিকট যে শরীয়ত অহী করা হয়েছে তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে উম্মতের ঐক্যমতে তার নির্ভুল হওয়ার বিষয়টি বিদগ্ধ আলেমগণ উল্লেখ করেছেন। বরং সমস্ত নবীই আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে যে অহী ও শরীয়তের তাবলীগ করেছেন, তাতে তারা মা'সুম বা ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন। বরং আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীকে নবুওয়াতের পূর্বেই শির্ক, অশ্লীলতা ও অন্যান্য অপকর্ম থেকে হেফাযত করেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, জাহেলী যুগের লোকেরা যেসব কাজ করতো, আমি কখনো তা করার কল্পনা করিনি এবং আমি কখনো খারাপ কাজ করার ইচ্ছাও পোষণ করিনি, এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর রেসালাতের দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করেছেন। ইমাম কাযী ইয়ায তাঁর আশ-শিফা নামক কিতাবে এবং অন্যান্য স্থানে একথা উল্লেখ করেছেন।

ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তাআলার হেফাযত ও সংরক্ষণাধীন থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যৌবনে পদার্পন করেছেন। তিনি যেহেতু তাঁকে রেসালাতের বিরাট দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করবেন, তাই তাঁকে জাহেলিয়াতের কদর্যতা ও দোষ-ত্রুটি থেকে সংরক্ষণ করেছেন। অথচ তিনি তখন তাঁর গোত্রের ধর্মের উপরেই ছিলেন। যৌবনে পদার্পন করে তিনি তাঁর গোত্রের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব, সর্বোন্নত চরিত্র, মেলামেশায় সর্বাধিক ভদ্র, প্রতিবেশীর সাথে সর্বোত্তম আচরণ, সুমহান চারিত্রিক স্বভাব এবং আমানতদারীতে সর্বাধিক সত্যবাদী রূপে পরিচিত ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি নিজের চারিত্রিক পবিত্রতা ও মর্যাদাকে সংরক্ষণ করণার্থে অশ্লীলতা এবং ঐসব চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি থেকে সর্বাধিক দূরে অবস্থান করেছেন, যা মানুষকে কলুষিত করে ফেলে। একারণে তাঁকে স্বীয় গোত্রের মধ্যে আল-আমীন বা সত্যবাদি বিশ্বস্ত বলে ডাকা হতো। কেননা আল্লাহ তাআলা শৈশবকালে এবং জাহেলী যুগে তাঁর মধ্যে এগুনটির সমাহার ঘটিয়েছেন।

তৃতীয় বিষয়:মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের ব্যাপকতা:অন্যান্য নবীদের উপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য দ্বারা খাস করা হয়েছে। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত মুত্তাফাক আলাইহি হাদীছে তার জবানেই তার কতক উল্লেখ করা হয়েছে।"আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কাউকেও দেওয়া হয়নি। (১) আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যে, একমাস দূরত্বেও তা প্রতিফলিত হয়; (২) সমস্ত যমীন আমার জন্য পবিত্র ও সালাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কোন লোক ওয়াক্ত হলেই সালাত আদায় করতে পারবে; (৩) আমার জন্য গানীমাতের মাল হালাল করে দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কারো জন্য হালাল করা হয়নি; (৪) আমাকে (ব্যাপক) শাফা'আতের অধিকার দেয়া হয়েছে; (৫) সমস্ত নবী প্রেরিত হতেন কেবল তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্য, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য।আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন"আমি লাল ও সাদা চামড়া সবার কাছে প্রেরিত"।মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।এরই ভিত্তিতে সমগ্র মানব জাতির ওপর তাঁরই অনুসরণ ও আনুগত্য করা আবশ্যক। কারণ, তাঁর উম্মতের সমস্ত মানুষই দাওয়াত প্রাপ্ত উম্মত। আল্লাহ তাআলা বলেন,"আর আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছি"।সূরা সাবা, আয়াত: ২৮অর্থাৎ, সমগ্র মানুষের জন্য।আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,"বল, হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর রাসূল"সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৮কুরআনের সম্বোধনসমূহ সমগ্র মানুষকে লক্ষ্য করেই এসেছে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী:"হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের রবের এবাদত করো"।সূরা বাকারা, আয়াত: ২১আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,হে মানুষ, অবশ্যই তোমাদের নিকট রাসূল এসেছে, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে। সুতরাং তোমরা ঈমান আন, তা তোমাদের জন্য উত্তম হবে।সূরা নিসা, আয়াত: ১৭০আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট আলো নাযিল করেছি।সূরা নিসাম, আয়াত: ১৭৪এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিনি তাঁর রবের পক্ষ হতে যা নিয়ে এসেছেন, সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।এ সব নস স্পষ্ট করে যে, সমস্ত মানুষ তাঁর রিসালাতের অনুসরণ করার আদেশপ্রাপ্ত এবং তাঁর আনুগত্য

করতে বাধ্য। আর এটিও প্রসিদ্ধ যে, তিনি যেমনিভাবে মানুষের জন্য প্রেরিত ঠিক তেমনই জিন জাতির জন্যও প্রেরিত। এ কথার জন্য আল্লাহ তা'আলা বাণী দ্বারা দলীল দেওয়া হয়:আর স্মরণ কর, যখন আমি জিনদের একটি দলকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তারা কুরআন পাঠ শুনছিল। যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল, তখন তারা বলল, 'চুপ করে শোন। তারপর যখন পাঠ শেষ হল তখন তারা তাদের কওমের কাছে সতর্ককারী হিসেবে ফিরে গেল।সূরা আহকাফ, আয়াত: ২৯তাঁর এ বাণী পর্যন্ত:'হে আমাদের কওম, আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আন।সূরা আহকাফ, আয়াত: ৩১অনুরূপ আল্লাহ তাআলার বাণী:বল, 'আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, নিশ্চয় জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে। অতঃপর বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে; অতঃপর আমরা তাতে ঈমান এনেছি।সূরা জিন, আয়াত: ১-২ইহুদী-খৃষ্ঠানরা মনে করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালাত শুধু আরবদের জন্য। তাঁর রেসালাত সত্য হওয়ার নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করার পর, অনেক মু'জেযা দ্বারা তাঁর রেসালাতকে শক্তিশালী করার বিষয়টি জেনে এবং তাঁর প্রচুর অনুসারী দেখেও তারা এ কথা বলেছে। তারা এ কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে যে, তিনি তাঁর রবের পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু অহংকার, পদমর্যাদার লোভ এবং পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে তাঁর অনুসরণ বর্জন করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তারা তাঁর সত্যবাদিতা, তাঁর রেসালাতের সত্যতা দেখে স্বীকার করেছে যে, তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাব আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অহী ছাড়া আর কিছুই নয়। তা সত্ত্বেও কুরআনে তাদেরকে সম্বোধন করে যেসব আদেশ করা হয়েছে, তা তারা গ্রহণ করেনি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ "আর তোমাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারীস্বরূপ আমি যা নাযিল করেছি তার প্রতি তোমরা ঈমান আন এবং তোমরা তা প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। আর তোমরা আমার আয়াতসমূহ সামান্যমূল্যে বিক্রি করো না এবং কেবল আমাকেই ভয় কর। আর সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করো না"।সূরা বাকারা, আয়াত: ৪১-৪২অনুরূপ আয়াত আরো রয়েছে।চতুর্থ বিষয়:তার রিসালাত পৌঁছানো:আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও আর যদি তুমি না কর তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না।সূরা মায়িদা, আয়াত: ৬৭এর মাধ্যমে তাঁকে তাঁর মহান প্রভুর পক্ষ হতে রেসালাতের বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। এটি তিনি অবশ্যই করেছেন। এটি শুধু তাঁরই দায়িত্ব ছিল না। বরং এটি ছিল সমস্ত রাসূল আলাইহিমুস সালামদের কাজ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরই একজন ছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ "শুধু পৌঁছিয়ে দেয়াই তোমার দায়িত্ব"।সূরা শুরা, আয়াত: ৪৮এবং তিনি বলেছেন,"পরিষ্কার ভাষায় শুনিয়ে দেয়া ছাড়া রাসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই"।সূরা নূর, আয়াত: ৫৪তাঁর সাহাবীগণ তার এ পৌঁছানো ও বর্ণনার সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,একটি পাখি তার দু'টি ডানা মেললে শিক্ষণীয় কি তার ইমল আমাদের জন্য উল্লেখ করা ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু বরণ করেননি।

আহমাদ ইবন মাজাহ রাহিমাহুল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك "আমি তোমাদেরকে একটি উজ্জ্বল পথে রেখে যাচ্ছি, যার রাত দিনের মতই। আমার পরে বদনসীব ব্যতীত অন্য কেউ তা থেকে বিচ্যুত হতে পারেনা"।

সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

আমার পূর্বে প্রেরিত প্রত্যেক নবীর উপর আবশ্যক ছিল, তিনি তাঁর উম্মতের জন্য যা কল্যাণকর জানবেন তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন এবং তাদের জন্য যা ক্ষতিকর জানবেন তা থেকে তাদেরকে সতর্ক করবেন।

এটি সুপ্রসিদ্ধ যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ জাতি ও দেশের লোকদেরকে প্রথমে দাওয়াত দেওয়া আরম্ভ করেছেন। অতঃপর আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অংশের আরবদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর তাদের পার্শ্ববতী লোকদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি মরুবাসী ও গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত আরব গোত্রগুলোর কাছে পত্র পাঠিয়ে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিয়েছেন এবং এই রেসালাত কবুল করার আহবান জানিয়েছেন। অতঃপর তিনি ইয়ামান, বাহরাইন ও অন্যান্য অঞ্চলে দাঈগণকে পাঠিয়েছেন। অতঃপর ইসলামী শরীয়তের দিকে দাওয়াত দিয়ে পারস্য ও রোমক সম্রাটদের নিকট চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর দাওয়াত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং দূর ও কাছের সকলের নিকট তাঁর দাওয়াত প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো।

অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ কাউকে হিদায়াত দিয়েছেন এবং তাদের মধ্য থেকে কারো উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে।

সূরা নাহাল, আয়াত:৩৬

এভাবেই তাঁর মৃত্যুর পরে সাহাবীগণ তাঁর দীনের দাওয়াত দিয়েছেন এবং যারা সেই দ্বীন কবুল করতে অস্বীকার করেছে তাদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করেছেন। যতক্ষণ না তারা ইসলামে প্রবেশ করেছে অথবা জিযিয়া দিয়ে লাঞ্ছনা ও অপমানকে আবশ্যক করে নিয়েছে, যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই দীনের দাওয়াত পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে গিয়েছে। ইতিহাসের কিতাবগুলোতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। এদত সত্ত্বেও যে লোক দেশের দূর প্রান্তে বাস করে এবং যদি ধরে নেয়া হয় যে, সে এই শরীয়ত সম্পর্কে একেবারেই শুনেনি, তাহলে তার হুকুম হবে আহলে ফাতরাত বা যাদের কাছে কোনো রাসূল পাঠানো হয়নি তাদের মতই। তা সত্ত্বেও সে সত্য দীন অনুসন্ধানের ব্যাপারে আদিষ্ট, যেই দীনের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যে দীন তার আশপাশের লোকেরা পালন করে।

পঞ্চম বিষয়:

খাতমুন নবুওয়াত বা নবুওয়তের সমাপ্তি:

যেহেতু এই শরীয়ত পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য এবং দুনিয়ার সকল প্রান্তের সমস্ত মানুষকে এটি কবুল করে নেয়ার আদেশ করা হয়েছে। তার একমাত্র কারণ এটি সর্বশেষ শরীয়ত এবং সর্বশেষ আসমানী রেসালাত। অতএব আমাদের ওপর বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখেরী নবী ও সর্বশেষ রাসূল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ "মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ"।

সূরা আহযাব, আয়াত: ৪০

خاتم শব্দের ت বর্ণে ফাতহ (যবর) ও কাসরাহ (যের) উভয়ভাবে পঠিত। মূলত খাতাম ঐ জিনিষকে বলা হয়, যা দ্বারা পূর্বোক্ত বিষয় সমাপ্ত করা হয়। চিঠি লিখা শেষ হলে যা দ্বারা ছিল লাগানো হয়, তাকেও খাতাম বলা হয়। যাতে চিঠির সাথে সম্পর্কহীন আর কিছু যোগ করার সুযোগ না থাকে। মোট কথা আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যেসব নবী পাঠিয়েছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বশেষ। তিনি সর্বশেষ নবী হওয়া থেকে সর্বশেষ রাসূল হওয়া আবশ্যক হয়। মুসলিম ও অন্যান্য ইমাম আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

،مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا، فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به وبعجبون له ويقولون :هلا وضعت هذه اللبنة؟ !قال :فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين "আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উপমা হচ্ছে সে লোকের মতো যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলো। তবে প্রাসাদের একপার্শ্বে মাত্র একটি ইটের স্থান খালী রেখে দিলো। লোকেরা প্রাসাদটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এর প্রশংসা করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, কেন এ ইটটি স্থাপন করা হলো না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি হলাম সেই ইট। আমিই সর্বশেষ নবী"।

মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ জাবের ইবন মুতইম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إن لي أسماء :أنا محمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي
আমার অনেক নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ ও আহমাদ। আমি আল-মাহী (নিশ্চিহ্নকারী)। আমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা কুফরকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। আমি আল-হাশির (সমবেতকারী)। কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে আমার পশ্চাতে একত্রিত করা হবে। আমি আল-আকিব (সর্বশেষ আগমণকারী)। আমার পর আর কোনো নবী নেই"।

সুনানে আবূ দাউদ ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দীর্ঘ হাদীছে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي “আমার উম্মতের মধ্যে আমার পরে ত্রিশজন মিথ্যুকের আগমণ ঘটবে। তারা সবাই নবুওয়াতের দাবী করবে। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী। আমার পরে আর কোনো নবী নেই”।

সুতরাং বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী। তার পরে যে ব্যক্তি নবুওয়াত দাবি করবে, সে মিথ্যুক। আখেরী যামানায় ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম যখন অবতরণ করবেন, তখন তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীয়ত দ্বারা বিচার-ফয়সালা করবেন। তিনি এই উম্মতের একজন মানুষের মতই হবেন। তার উপর অহী নাযিল হলেও তিনি এই পবিত্র শরীয়ত বর্জন করবেন না। অতএব এই উম্মতের যে ব্যক্তি নবুওয়াত বা রেসালাতের দাবি করবে সে মিথ্যুক, প্রতারক, পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারী। যদিও সে সাধারণ ও মুর্খ লোকদেরকে অলৌকিক ঘটনা ও ভেলকিবাজি দেখায় এবং বিভিন্ন প্রকার যাদু এবং জাঁকালো কিছু দেখাতে সক্ষম হয়। আসওয়াদ আনাসী এবং মুসায়লামা কায্যাবের হাতে এ ধরণের কিছু শয়তানী অবস্থা এবং বাজে, মিথ্যা ও বানোয়াট জিনিষ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রত্যেক বিবেকবান লোকের সামনেই এগুলো মিথ্যা ও বানোয়াট হওয়ার কথা সুস্পষ্ট। আসওয়াদ আনাসী ও মুসায়লাহ কায্যাব ব্যতীত আরো যারা নবুওয়াত দাবি করেছিল, তাদের কিছু অনুসারী তৈরী হয়েছিল এবং তারা কিছুটা শক্তিও অর্জন করেছিল। তাদের কারণে কিছু লোক বিভ্রান্ত হয়েছে। এদের সর্বশেষ ব্যক্তি হলো গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী। তার ফিতনা যখন ছড়িয়ে পড়লো তখন ভারত, পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের অনেক সম্প্রদায় ও গোষ্ঠি তার ফিতনায় আক্রান্ত হয়েছে। এমনিভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যারাই নবুওয়াত দাবি করবে, তাদের কারণে মানুষ বিভ্রান্ত হবে। তাদের সর্বশেষ হবে মিথ্যুক দাজ্জাল। তার ফিতনার বিষয়টি সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য উম্মতকে সাবধান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

‘আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব, কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়’? তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক চরম মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট।

সূরা শুআরা, আয়াত: ২২১-২২২

এটি প্রমাণ করে যে, উপরোক্ত মিথ্যুকদের কাছে শয়তান আসে এবং তাদেরকে ধারণা দেয় যে, তাদের কাছে যা আসে তা আল্লাহর পক্ষ হতে অহী। তবে সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর রীতি-নীতি হলো তিনি সত্য বিষয়ের ওপ নূর স্থাপন করেন। আর মিথ্যা ও বানোয়াট বিষয়ের ব্যাপারে কথা হলো জ্ঞানীদের সামনে তার মুখোশ উন্মুক্ত হয়।

ষষ্ঠ বিষয়:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি উম্মতের করণীয়:

আমরা যখন জানলাম যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তাতে তিনি সত্যবাদী, তার রিসালাত সত্য এবং তাকে সত্যারোপ করা ওয়াজিব। বস্তুত এটিই হচ্ছে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল সাক্ষীর অর্থ, যার দাবি হচ্ছে তাকে সত্যারোপ করা অতঃপর তার অনুসরণ করার মাধ্যমে ইবাদত আঞ্জাম দেওয়া। আর এর পশ্চাতে যে সাওয়াব আছে এবং তা ত্যাগ করাতে যে পাপ আছে তাতে ঈমান আনয়ন করা। কারণ আমাদের ওয়াজিব হচ্ছে আমরা তা বাস্তবায়ন করবো এবং আমাদের জীবনে তার প্রতিফলন ঘটাবো। আর তা রূপায়িত হবে কুরআন ও সুন্নাহতে যে নির্দেশসমূহ রয়েছে তা বাস্তবায়ন করার দ্বারা, যেমন:

প্রথমত: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনা:

আল্লাহ তাআলা তাঁর নির্দেশ দিয়েছেন যেমন তিনি আল্লাহ, ফেরেশতা এবং আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি এর ওপর প্রচুর ছাওয়াব দান ও তা ছাড়ার ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারণ করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا “হে মুমিনগণ, তোমরা ঈমান আনয়ন করো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে।

সূরা নিসা, আয়াত: ১৩৬

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন, আর তোমাদেরকে নূর দেবেন যার সাহায্যে তোমরা চলতে পারবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।

সূরা হাদীদ, আয়াত: ২৮

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا "তাই ঈমান আনয়ন করো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেই নূর বা আলোর প্রতি যা আমি নাযিল করেছি"।

সূরা তাগাবুন, আয়াত: ৮

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে।

সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৮

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরো বলেন,

আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে না তবে নিশ্চয় আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি জ্বলন্ত আগুন।

সূরা ফাতাহ, আয়াত: ১৩

এ বিষয়ে এ ছাড়া আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ ও অন্যারা আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমার প্রতি ও আমি যা নিয়ে এসেছি তার প্রতি ঈমান আনয়ন করবে"।

জিবরীলের হাদীস নামী প্রসিদ্ধ হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বলে ঈমানের ব্যাখ্যা করেছেন:

"তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেস্তা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ,আখেরাত দিবস ও তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান আনবে"।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়ন করার অত্যাবশ্যকীয় দাবি হলো, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে যা নিয়ে এসেছেন, তা সত্যায়ন করা এবং তাঁর রেসালাতের সত্যতায় বিশ্বাস করা। কেননা ঈমানের মূল হচ্ছে কোনো বিষয়ের প্রতি অন্তর দিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করা এবং আস্থাশীল হওয়া। অতঃপর জেনে-বুঝে এবং বিশ্বাস সহকারে জবান দিয়ে তা উচ্চারণ করা। অতঃপর কাজকর্মের মাধ্যমে ঈমানের দাবি বাস্তবায়ন করা। এসব বিষয়ের সমন্বয়ে ঈমান পরিপূর্ণ হয় এবং এই পরিপূর্ণ ঈমানই নাজাতের উসীলা হবে। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, অন্তরের বিশ্বাস ছাড়া এ সাক্ষ্য দেয়া অনর্থক। এরূপ সাক্ষ্য দানকারীর সাক্ষ্য কোনো উপকার করবে না। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা মুনাফেকদেরকে মিথ্যুক বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।

সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত: ১

দ্বিতীয়ত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার আদেশ ও তাঁর অবাধ্যতা থেকে সতর্ক করা:

আর সন্দেহ নেই যে, তাঁর আনুগত্য করাই তাঁর প্রতি ঈমানের আলামত। কারণ তাঁর সততায় দৃঢ় বিশ্বাস করার দাবি হলো তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে যা পৌঁছিয়েছেন তাতে তাঁর আনুগত্য করা। অতএব যে ব্যক্তি অহংকার কিংবা অলসতাবশত তাতে তাঁর পুরোপুরি কিংবা তার অংশ বিশেষের বিরোধিতা করল সে তাঁর রেসালাতের সাক্ষীতে সত্যবাদী নয়। অধিকন্তু আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমের অনেক স্থানে তাঁর আনুগত্য করার আদেশ করেছেন। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
“হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনে থাকো”।

সূরা নিসা, আয়াত: ৫৯

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ “আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের আর সাবধান হও। তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্ট প্রচার।

সূরা মায়িদা, আয়াত: ৯২

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

‘قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا’ “বলো, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে সে শুধু তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে”।

সূরা নূর, আয়াত: ৫৪

অনুরূপ অর্থে আল্লাহ তা‘আলা বাণী:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا “রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও”।

সূরা হাশর, আয়াত: ৭

বরং রাসূলের আনুগত্য করার ওপর প্রচুর ছাওয়াব নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ “আর তোমরা আনুগত্য কর রাসূলের, যাতে তোমাদেরকে দয়া করা হয়”।

সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৩২

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন,

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল।

সূরা আহযাব, আয়াত: ৭১

অনুরূপভাবে তার নাফরমানীর ওপর ভয়াবহ শাস্তির ধমক দিয়েছেন।

আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব।

সূরা নিসা, আয়াত: ১৩-১৪

আর জাহান্নামীদের থেকে তাদরে কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন:

يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ "হায় আফসোস! যদি আমরা আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করতাম"।

সূরা আহযাব, আয়াত: ৬৬

সহীহ হাদীসে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণি, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله "যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্য হল সে আল্লাহর অবাধ্য হল"।

এর অর্থ হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই বিষয়ের আদেশ করেন আল্লাহ যা তাঁর নিকট প্রত্যাদেশ করেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা তাঁর রবেরই অনুগত্য করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا "যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হল, তবে আমরা তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করিনি"।

সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮০

বুখারী রাহিমাহুল্লাহ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

সব মানুষই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে সে ব্যক্তি নয়, যে অস্বীকার করে। তাঁরা বললেন, কিভাবে অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে আমার নাফরমানী করল সেই অস্বীকার করল"।

আর সন্দেহ নেই যে, তাঁর আনুগত্য হলো, তিনি যে আদেশ করেছেন তা করা এবং তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে দূরে থাকা। সেই সঙ্গে তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তা মেনে নেওয়া, তাঁর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর শরীয়তের ওপর আপত্তি তোলা ছেড়ে দেওয়া অথবা তাঁর তার বিধানের পরিবর্তন ও সমালোচনা না করা।

তৃতীয় বিষয়: তিনি উম্মতকে তাঁর অনুসরণ ও তাঁর সুন্নত মেনে চলার আদেশ করেছেন।

আল্লাহ তার ওপর হিদায়াত ও ক্ষমাকে নির্ধারণ করেছেন। এবং তাঁকে আল্লাহ তাআলার প্রতি সত্যিকার ভালোবাসার নিদর্শন করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ "তোমরা তাঁর অনুসরণ করো। এতে করে তোমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে"।

সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৫৮

ইহুদী খৃষ্টানরা যখন দাবি করলো যে, তারা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়জন, তখন তিনি পরীক্ষার আয়াত নাযিল করলেন। আর তা হলো তার বাণী:

বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। বল, 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর'। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না।

সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৩১-৩২

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে"।

সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১

নিঃসন্দেহে বান্দাদের উপর আবশ্য হলো, তারা তাদের রবকে ভালোবাসবে। যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার নেয়ামত দিয়েছেন। তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার

উপর এই ভালোবাসা অর্জিত হওয়া এবং তা গৃহিত হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করছে। যারা তাঁর অনুসরণ করবে বিনিময় স্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এই ছাওয়াব রেখেছেন যে, তিনি তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করবেন। তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণের আলামত হলো তাঁর অনুসরণ করা, তাঁর পথে চলা, তাঁর জীবনী, আমল এবং এবাদতের রীতি-নীতির অনুকরণ করা। সেই সঙ্গে তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে দূরে থাকা এবং তার এমন বিরোধিতা থেকে সতর্ক থাকা, যার কারণে মানুষ তাঁর অনুকরণ থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যায়। যেমন সহীহ বুখারীতে নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

যে আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো সে আমার (উম্মত) থেকে নয়।

চতুর্থতঃ ইলাহকে অন্তর ও দেহে সত্যিকারভাবে ভালোবাসা।

বরং তাঁর মহব্বতকে অন্য সব কিছুর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

বল, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত'। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ২৪

দেখুন, এখানে কীভাবে আল্লাহ তা'আলা এ আটটি প্রকারের কোন একটিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার উপর অগ্রাধিকার দেয়াকে তিরস্কার করেছেন। যেগুলোর প্রতি সাধারণত মানুষের মন আকৃষ্ট হয় এবং যে জন্য মানুষ এ দুনিয়ার জীবনকে আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর তিনি তাদেরকে "অপেক্ষা করো..." শব্দে ধমক দিয়েছেন। অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করো। এটি আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও তাঁর রাগের প্রতিক্রিয়া, যার কারণে শাস্তি নাযিল হয়। এতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা ওয়াজিব হওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণ রয়েছে। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর হাদীসে গুরুত্বসহ সাব্যস্ত করেছেন। যেমন: আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাণী:

"যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে তার দ্বারা ঈমানের মিষ্টতা লাভ ক'রে: আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে; কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহ'র জন্যই ভালবাসবে। আর কুফরী থেকে তাকে আল্লাহর বাঁচানোর পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে নিজেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করাকে অপছন্দ করে।"

মুত্তাফাকুন আলাইহি। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আনাস —রাযিয়াল্লাহু আনহু— থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম— বলেছেন:

"তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার সন্তান, তার পিতা ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় না হই"।

উমার ইবনুল-খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু যখন বললেন:

আল্লাহর কসম! অবশ্যই আপনি আমার নিকট সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়। তবে আমার জীবনের চেয়ে বেশি প্রিয় নন। তখন তিনি বললেন:

না, হে উমার! এখনো তুমি পরিপক্ক ঈমানদার হতে পারোনি যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট তোমার জীবনের চেয়ে বেশি প্রিয় হবো। তখন (উমার) রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন: আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আপনি আমার নিকট সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় এমনকি আমার জীবনের চেয়েও। তখন তিনি বললেন: এখন হয়েছে হে উমার!

এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর ভালোবাসার একটি সুফল হলো পরকালে তাঁর সাথে জমায়েত হওয়া। কারণ যখন জনৈক ব্যক্তি তাঁকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো তখন তিনি বললেন:

তুমি সেদিনের জন্য কী প্রস্তুত করেছো? সে বললো: আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই প্রস্তুত করিনি। তখন তিনি বললেন: তুমি যাকে ভালোবেসেছো তার সাথেই তুমি থাকবে।

বিশুদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ে ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

ব্যক্তি তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালবাসে।

এটিই এ ভালোবাসার প্রতিদান ও পুরস্কার হিসেবে যথেষ্ট। তবে সত্যিকারের ভালোবাসা তাঁর অনুসরণ করতে, তাঁর শিষ্টাচারে শিষ্ট হতে ও তাঁর সুন্নাতকে সবার সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দিতে বাধ্য করে। তেমনিভাবে তা আবশ্যক করে যে তাঁকে ভালোবাসে ও বন্ধু মনে করে তার ভালোবাসাকে এবং যে তাঁকে ঘৃণা করে ও শত্রু মনে করে তার ঘৃণাকে। যদিও সে খুবই নিকটের কেউ হয়। যে ব্যক্তি এ বৈশিষ্ট্যকে পরিপূর্ণরূপে ধারণ করেছে সেই এ ভালোবাসায় সত্যবাদী। আর যে ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম করেছে অথবা এতে কোন ধরনের ত্রুটি করেছে তাহলে তার ভালোবাসা ততটুকুই ত্রুটিপূর্ণ হবে।

পঞ্চমতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া এবং তাঁকে শক্তিশালী করা।

যেভাবে আল্লাহর বাণীতে উল্লিখিত হয়েছে:

“যেন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনো এবং তাঁকে শক্তিশালী ও সম্মানিত করো।

সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ৯

আর আল্লাহ তা'আলা বাণী:

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না এবং তোমরা নিজেরা পরস্পর যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরকম উচ্চস্বরে কথা বলো না। এ আশঙ্কায় যে তোমাদের সকল আমল-নিষ্ফল হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না। নিশ্চয় যারা আল্লাহর রাসূলের নিকট নিজদের আওয়াজ অবনমিত করে, আল্লাহ তাদেরই অন্তরগুলোকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করেছেন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

সূরা আল-হুজুরাত: ১,৩

আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে তাঁর সামনে তাঁর আনীত বিধানের বিপরীত কোন মত ও দৃষ্টিকোণ পেশ করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি তাদের নিষেধ করেছেন তাঁর সামনে আওয়াজকে উঁচু করতে অথবা বিনা অজুহাতে তাঁর সাথে জোরে কথা বলতে। এবং এর ওপর তিনি তাদের আমল নষ্টের হুমকি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

“তোমরা রাসূলের ডাকাকে তোমাদের নিজেদের মধ্যকার একে অপরকে ডাকার ন্যায় বানাবে না”।

সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬৩

অর্থাৎ তোমরা তাঁকে তাঁর মূল নামে ডেকো না যেমনিভাবে তোমাদের কেউ অন্যকে ডাকে। বরং তোমরা তাঁকে তাঁর বিশিষ্ট নামে ডাকো। যেমন, তোমরা বলবে: হে আল্লাহর নবী! অথবা হে আল্লাহর রাসূল! কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে বিশেষিত করেছেন।

তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া এবং তাঁকে শক্তিশালী করার অংশ হচ্ছে তাঁর সুন্নাতকে সম্মান করা এবং তাঁর অনুসারীদের মনে তার মর্যাদা সুউচ্চ করা। যার দ্বারা তাঁর অনুসরণ ও তাঁর আদেশ মানা এবং তার নিষেধ থেকে পরহেয করা সহজ হয়।

ষষ্টত: তাঁর নিকট বিচার প্রার্থী হওয়া, তাঁর ফায়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়া ও তাঁর ওপর আপত্তি করা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

“তোমরা যদি কোন ব্যাপারে ঝগড়ায় লিপ্ত হও তাহলে সেটিকে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দিবে”।

সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

“যারা তাঁর আদেশের বিপরীত করে তাদের এ ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত যে, যেন তাদেরকে কোন ফিতনা কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না পেয়ে বসে”।

সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬৩

সকল উম্মত একমত যে, তাঁর (মৃত্যুর) পর তাঁর সুন্নতের দিকেই ফিরে যেতে ও বিচার প্রার্থী হতে হবে। এ আয়াতগুলোতে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ হারাম এবং তাঁর সুন্নাতের বিকল্প অনুসন্ধান না করার পক্ষে মহা প্রমাণ রয়েছে। দেখুন, কীভাবে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর আদেশ অমান্যকারীদেরকে ফিতনা দ্বারা সতর্ক করেছেন, আর ফিতনা হচ্ছে শিরক বা বক্রতা এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দ্বারা সতর্ক করেছেন। আর কীভাবে তিনি তাদের ঈমান না থাকার ব্যাপারে কসম খেয়েছেন যতক্ষণ না তারা তাঁকে নিজেদের মধ্যকার সৃষ্ট সকল দ্বন্দ্বের ফায়সালাকারী বানাবে এবং তার সিদ্ধান্তকে মেনে নিবে। আর তাদের অন্তরে উক্ত ফায়সালার ব্যাপারে কোন ধরনের সংকোচ বা মনোকষ্ট না থাকবে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি তাঁর সুন্নাতের বিধান জানার পরও সেটিকে অবহেলা করে ও হাল্কা ভেবে তা পরিত্যাগ করেছে এবং তার বিকল্প হিসেবে মানব রচিত বিধি-বিধান, মতামত ও প্রচলন ইত্যাদিকে গ্রহণ করেছে তার জন্য এ হুমকি ও ধমকিই যথেষ্ট।

সপ্তম বিষয়:

(নবী) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা ও ভারসাম্যতা বজায় রাখা।

আল্লাহর নীতি তাঁর সৃষ্টির মাঝে বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে সদা চালু রয়েছে এবং প্রত্যেক জাতি থেকেই কমবেশি বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি সংঘটিত হয়। এজন্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর অনুসারী উম্মতকে তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে এবং তাঁকে আল্লাহর খাঁটি অধিকার থেকে কোন কিছু দিতে সতর্ক করেছেন। যা নিচের আলোচনা থেকে আরো সুস্পষ্ট হয়:

প্রথমতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যাননি।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

বলুন, “আমি তো কেবল তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তবে আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়”।

সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ১১০

আয়াতটি স্পষ্ট করেছে যে, তিনি কেবল ওহী দ্বারা বিশেষিত।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

“বল, ‘পবিত্র মহান আমার রব! আমি তো একজন মানব-রাসূল ছাড়া কিছু নই’?”

সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৯৩

এটি তখনই বলা হয়েছে যখন মুশরিকরা তারঁ কাছে যমীন বাহমান হওয়া বা আসমান তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করা ইত্যাদি কামনা করে, তখন তিনি তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, যিনি একাজগুলো করতে ক্ষমতা রাখেন তিনি হলেন তাঁর রব যিনি একক। আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেবল রিসালাত কর্তৃক বিশিষ্ট হয়েছেন যার দায়িত্ব আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন।

পূর্বের উম্মতগণ কর্তৃক রাসূলদের রিসালাতের ব্যাপারে তাদেরকে মানুষ বলে আপত্তি করার বিষয়টি আল্লাহ বর্ণনা করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা হূদ কিংবা সালেহ এর সম্প্রদায় সম্পর্কে তার বাণীতে বলেছেন:

‘সে কেবল তোমাদের মত একজন মানুষ, সে তাই খায় যা থেকে তোমরা খাও এবং সে তাই পান করে যা থেকে তোমরা পান কর’। ‘আর যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে’।

সূরা আল-মু'মিনূন, আয়াত ৩৩,৩৪

আর তিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে মিথ্যারোপকারীদের ব্যাপারে বলেন, তারা বললো:

"এ রাসূলের কী হলো যে, সে খানা খায় এবং বাজারে হাঁটাচলা করে"।

সূরা আল-ফুরকান, আয়াত:৭

অর্থাৎ, সে কামাই ও রিযিক অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা করে। ফলে তিনি তার উত্তর এভাবে প্রদান করেন:

"আর তোমার পূর্বে যত নবী আমি পাঠিয়েছি, তারা সবাই আহার করত এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করত।

সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২০

অর্থাৎ তারা ফিরিশতা নয়। কারণ, মানুষ সাধারণত ফিরিশতাদেরকে দেখার ক্ষমতা রাখে না। বরং যদি আল্লাহ ফিরিশতাকে পাঠাতেন, তারা তাঁকে দেখতে পেতো না যতক্ষণ না তিনি মানুষের আকৃতি ধারণ করতেন। তখনও সন্দেহের সৃষ্টি হতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

আর যদি রাসূলকে ফেরেশতা বানাতাম তবে তাঁকে পুরুষ মানুষই বানাতাম। ফলে তারা যে সন্দেহ করে, সে সন্দেহেই তাদেরকে রেখে দিতাম।

সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৯

যখন তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সালাতে ভুল সংঘটিত হলো, তারা তাঁকে তা এ মনে করে স্মরণ করিয়ে দেয়নি যে, হয়তোবা সালাতকে কমিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন:

"আমি তো কেবল তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমিও ভুলে যাই যেমন তোমরাও ভুলে যাও। অতএব, যখন আমি ভুলে যাই তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে"।

মুত্তাফাকুন 'আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)

যেহেতু রাসূলগণ মানুষ তখন আল্লাহর কোন হক কর্ম বা গুণ যাই হোক তাঁদেরকে দেয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানেন না।

তিনি ততটুকুই সংবাদ দেন যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন ও তাঁর নিকট ওহী করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

বল, 'তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি না এবং তোমাদেরকে বলি না, নিশ্চয় আমি ফেরেশতা। আমি কেবল তাই অনুসরণ করি যা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয়'।

সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৫০

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

আপনি বলুন: আমি নতুন কোন রাসূল নই। আর আমি জানি না যে, আমার ও তোমাদের সাথে কী আচরণ করা হবে।

সূরা আল-আহকাফ. আয়াত: ৯

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

"আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে আমি বেশি বেশি কল্যাণ গ্রহণ করতাম এবং আমাকে কোন অকল্যাণই স্পর্শ করতো না"।

সূরা আল-আ'রাফ. আয়াত: ১৮৮

অতএব আল্লাহ ছাড়া কেউই গায়েব জানে না। তবে তিনি তাঁর কতক সৃষ্টির নিকট তার কিছু প্রকাশ করেন মু'জিযা ও তার সততার প্রমাণ স্বরূপ। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

“তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া। আর তিনি তখন তার সামনে ও তার পিছনে প্রহরী নিযুক্ত করবেন।”।

সূরা আল-জিন: ২৬-২৭

অর্থাৎ তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিবর্গ তথা তাঁর রাসূলগণকে পূর্ব বা পরের কিছু গায়েবী বিষয় জানিয়ে দেন। যা নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণীটির বিরোধী নয়:

বলুন, আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূহে ও জমিনে যারা আছে তারা গায়েব জানে না। আর কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে তা তারা অনুভব করতে পারে না।

সূরা আন-নামাল: আয়াত : ৬৫

ভবিষ্যত বিষয়াদি সম্পর্কে হাদীসসমূহে যে সংবাদগুলো এসেছে তা সেই ওহী যা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলকে ফিরিশতা রাসূলের মাধ্যমে অবগত করেছেন অথবা তার ওপর যা খুলে দিয়েছেন বা তাকে ইলহাম করেছেন। যখন এ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পূর্বেকার অন্যান্য রাসূলগণের বৈশিষ্ট্য, তখন আল্লাহর কোন অধিকার যেমন তাঁরই ইবাদত করা যিনি একক তাদেরকে সোপর্দ করা যাবে না। এবং যে বৈশিষ্ট্য রবের সাথে খাস সে সব বৈশিষ্ট দ্বারা তাদেরকে বিশেষিত করা যাবে না। এ জন্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রবী’ ইবনু মু‘আওয়িযের নিকটে থাকা সেই মেয়ে দু’টির নিম্নোক্ত কথাকে প্রত্যাখ্যান করলেন:

আমাদের মাঝে এমন এক নবী আছেন যিনি আগামী কালের সবকিছুই জানেন।

এটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন:

কেউ যদি তোমাকে বলে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আগামী দিনের সবকিছুই জানেন তাহলে তুমি তাকে বিশ্বাস করো না।

এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

জিবরীল (আলাইহিস-সালাম) এর হাদীসে এসেছে, যখন তিনি কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন:

“এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত (ব্যক্তি) জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশী অবহিত নয়। তবে আমি তোমাকে তার নিদর্শন সম্পর্কে সংবাদ দিব: যখন কৃতদাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। আর যখন তুমি নগ্নপদ, বস্ত্রহীন ও দরিদ্র ছাগলের রাখালদেরকে অট্টালিকার ওপর গর্ব করতে দেখবে।” পাঁচটি বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। অতঃপর তিনি পাঠ করেন, “নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জরায়ূতে যা আছে, তা তিনি জানেন। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে সে মারা যাবে।

মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)

এ পাঁচটিই হলো গায়েবের চাবিকাঠি যা আল্লাহর বাণীতে উল্লিখিত হয়েছে:

“তাঁর কাছেই রয়েছে গায়েবের সবগুলো চাবি যেগুলো তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না।

সূরা আল-আন‘আম: আয়াত: ৫৯

সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলোর কোনটির জ্ঞানের দাবি করলো অথবা এগুলোর কোনটিকে কোন মানুষের সাথে সম্পৃক্ত করলো, সে নিশ্চয়ই মিথ্যুক।

তৃতীয়তঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই নিজের কোন লাভ-ক্ষতির মালিক নন। অন্যের তো দূরের কথা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

“বল, ‘আমি আমার নিজের কোন উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান।

সূরা আল-আ'রাফ: আয়াত: ১৮৮

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

"হে রাসূল! আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কোন ক্ষতি বা হিদায়েতের মালিক নই"।

সূরা আল-জিন: আয়াত: ২১

আর তা এ কারণেই যে, নিশ্চয়ই রাজত্ব আল্লাহর জন্যই যিনি একক। তাঁর হাতেই সকল লাভ ও ক্ষতি এবং দান ও বঞ্চিত করণ। তিনিই সকল ক্ষমতার মালিক। তাঁর ফায়সালা প্রতিরোধ ও তাঁর হুকুম প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই।আর নবীগণসহ তাঁর সৃষ্টির সবাই তাঁর মালিকানাধীন। যাদেরকে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী শামিল করে:

"তারা আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়। আর এ দু'য়ের মধ্যে তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সাহায্যকারীও নয়।

সূরা সাবা: আয়াত: ২২

শাইখুল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) এ আয়াত শেষে বলেন: আল্লাহ তা'আলা তিনি ছাড়া অন্য সবকিছুকেই অস্বীকার করেছেন যেগুলোর সাথে মুশরিকরা সম্পৃক্ত হয়। যেমন তিনি অন্যের মালিকানা বা অংশীদারিত্ব বা আল্লাহর সহযোগী হওয়াকে অস্বীকার করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন,

এ বিষয়ে তোমার কোনো অধিকার নেই।

সূরা আলে ইমরান: আয়াত : ১২৮

এটি তখনই বলা হয়েছে যখন উহুদের যুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাথা ফাটিয়ে ও তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল, তখন তিনি বলেন,

কীভাবে সে জাতি সফলকাম হবে যারা নিজেদের নবীর মাথা ফাটিয়েছে?!

অথবা এটি ছিল যখন (নবী) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কিছু মুশরিকের ওপর কুনূত পড়ে বদ-দু'আ করতে ছিলেন, তখন আল্লাহ তা অপন্দ করলেন এবং তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, সকল ব্যাপার একমাত্র আল্লাহর জন্য। এ ব্যাপারে তাঁর কোন কিছুই করার নেই।

বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে ভীতি প্রদর্শন করেন এবং তাদের তিনি বলেন:

তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। আমি আল্লাহর থেকে তোমাদের কোন উপকারে আসবো না।

এমনকি এ কথা তিনি তা নিজের চাচা, ফুফী এবং মেয়েকেও বললেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

তোমরা নিজেদেরকে কিনে নাও।

অর্থাৎ আল্লাহর তাওহীদ ও তাঁর জন্য ইবাদাতকে খাঁটি করে এবং তিনি যার আদেশ করেছেন তা মেনে ও তিনি যার থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থেকে (জান্নাত কিনে নাও)। কারণ, এতেই রয়েছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি, বংশ ও আত্মীয়তার উপর নয়। তিনি এর মাধ্যমে এমন কিছু লোকের সন্দেহ দূর করলেন যারা মনে করে যে, তিনি তাঁর আত্মীয়দের জন্যে যথেষ্ট হবেন ও তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। এ চিন্তাটি বিপুল সংখ্যক মানুষের মনে দানা বেঁধেছে ও তাদের ভেতর অনুপ্রবেশ করেছে। তাই আপনি তাদেরকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বংশের সাথে শুধু সম্পৃক্ততার উপর নির্ভরশীল হতে ও তাকে সম্মানজনক বলে মনে করতে দেখবেন। তারা মনে করে যে, মুক্তি ও সুপারিশ আমল ছাড়াই হাসিল যাবে। বরং তারা তাঁর আদর্শের বিরোধিতা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করে। তেমনিভাবে আরেকটি দল রয়েছে যারা তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ ছাড়া কেবল তাঁর মনগড়া ভালোবাসাকে ধারণ করে আছে। তারা বিশ্বাস করে যে, তিনি এ মনগড়া ভালোবাসার ভিত্তিতেই তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। যদিও তার ভালোবাসার আলামত তথা তাঁর অনুসরণ ও তাঁর দেখানো পথের বিপরীতে চলে। অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই নিজের

লাভ-ক্ষতির মালিক নন এবং তিনি আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করলে নিজের উপর থেকে আযাব ও ক্ষতি প্রতিরোধ করতে সক্ষম নন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

বল, 'নিশ্চয় আল্লাহর কাছ থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ছাড়া কখনো আমি কোন আশ্রয়ও পাব না।

সূরা আল-জিন, আয়াত: ২২

তাহলে তাঁর নিকটের (আত্মীয়ের) বা দূরের (অনাত্মীয়ের) অবস্থা কীরূপ হবে?!

অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ আত্মীয়দেরকে স্পষ্ট বলেছেন, তিনি না তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন, না তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, না তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবেন। বরং তাদের আমলগুলোই তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে।

বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবের হিদায়েতের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তিনি তাতে সক্ষম হননি। যখন তাঁর মৃত্যু উপস্থিত হলো, তিনি তার কাছে এসে বললেন:

"হে চাচা! বলুন, "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই" এ কালিমা দ্বারা আল্লাহর নিকট আপনার জন্যে সুপারিশ করবো।

তখন খারাপ সাথীরা তাকে শয়তানী যুক্তি শেখালো।ফলে তার শেষ কথা ছিলো, সে আব্দুল-মুত্তালিবের ধর্মের উপরই রয়েছে। এ ব্যাপারেই আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী নাযিল হয়েছে,

নিশ্চয় আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে আপনি হিদায়াত দিতে পারবেন না; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন।

সূরা আল-কাসাস: আয়াত: ৫৬

এ ঘটনায় সেই মুশরিকদের সন্দেহ বাতিলের সর্ববৃহৎ প্রমাণ রয়েছে যারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে এবং তাঁর নিকট বিপদ দূর করা ও গুনাহ মাফ কামনা করে। আর কঠিন বিপদের সময় তাঁর নাম ধরে ইয়া রাসূলাল্লাহ ইত্যাদি বলে চিৎকার করে।

বলাবাহুল্য যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও তাদের তুলনায় আল্লাহর অতি নিকটবর্তী এবং সম্মানের দিক দিয়ে তাদের তুলনায় মহান, অধিকন্তু তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর সময় হিদায়েতের ওপর আগ্রহী ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি তা করতে পারেননি। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দুর্ভাগ্য লিখে রেখেছেন। উপরন্তু তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার প্রতিজ্ঞা করেন, আল্লাহ তাঁর থেকেও তাঁকে নিষেধ করেছেন এভাবে:

নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা আত্মীয় হয়। তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয় তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী।"।

সূরা আত-তাওবাহ: আয়াত: ১১৩

এতে দলীল রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যের লাভ বা ক্ষতির মালিক নন। যদিও সে তাঁকে ডাকে, তাঁকে আশা করে ও তাঁর নাম ধরে চিৎকার করে। যদিও সে মনে করে যে, সে তাঁকে কঠিনভাবে ভালোবাসে। যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট অন্তরসমূহের হিদায়েত অথবা বিপদ দূর করার কোন কিছু থাকতো তাহলে এর সর্বাধিক উপযুক্ত ছিলো তাঁর সেই বড় চাচা যে তাঁর অভিভাবকত্ব ও তাঁকে রক্ষা করেছে এবং তাঁর ও মুশরিকদের কষ্টদানের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। যখন তিনি তাকে হিদায়েত দিতে ও রক্ষা করতে পারলেন না তাহলে অন্যরা তো আরো আগে।

চতুর্থতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য আল্লাহর গোলাম হওয়াই সম্মান ও ফযীলতের বিষয়:

বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে প্রমাণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

তোমরা আমার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমনটি খৃষ্টানরা ইবনু মারইয়্যাম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো কেবল বান্দা। তাই তোমরা বল, আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল।

শাইখ সুলাইমান ইবনু আব্দুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) এ হাদীস সম্পর্কে কিতাবুত-তাওহীদের ব্যাখ্যার ২৭২ পৃষ্ঠায় বলেন: তার বাণী:

আমি তো কেবল বান্দা। তাই তোমরা বলো: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

অর্থাৎ তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না যেমনিভাবে খ্রিস্টানরা ‘ঈসা (আলাইহিস-সালাম) এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তাঁর মাঝে রুবূবিয়্যাতের দাবি করেছে। বরং আমি হচ্ছি আল্লাহর বান্দা। অতএব, তোমরা তা দিয়েই আমার পরিচয় দিবে যেমনিভাবে আমার প্রতিপালক তা দিয়েই আমার পরিচয় দিয়েছেন। তোমরা বলবে: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। কিন্তু কবরপূজারীরা তাঁর আদেশের বিরোধিতা না করে ও তাঁর নিষেধাজ্ঞায় লিপ্ত না হয়ে ক্ষান্ত হয়নি। এমনকি তারা তাঁর চরম বিরোধিতা করেছে। আর তারা মনে করছে যে, যদি তারা তাঁকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলে গুণান্বিত করে এবং (বিশ্বাস করে যে,) তাঁকে ডাকা যাবে না, তাঁর দ্বারা সাহায্য চাওয়া যাবে না, তাঁর জন্য মানত করা যাবে না, তাঁর বসতঘরের চতুষ্পার্শ্বে তাওয়াফ করা যাবে না এবং তাঁর হাতে কোনো কিছুই নেই এবং তিনি আল্লাহর জানানো ছাড়া কোন গায়েব জানেন না, তাহলে তাঁর অধিকার খর্ব ও তাঁকে অসম্মান করা হবে। তাই তারা তাঁকে তাঁর মর্যাদার উপরে উন্নীত করেছে এবং তাঁর মাঝে এমন কিছু দাবি করেছে যা খ্রিস্টানরা ‘ঈসা (আলাইহিস-সালাম) এর মধ্যে দাবি করেছে অথবা তার কাছাকাছি। তাই তারা তাঁর নিকট গুনাহ মাফ ও বিপদ দূর করার প্রার্থনা করে।

শাইখুল-ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) কোনো এক কিতাবে তাঁর যুগের জনৈক লোক থেকে ইস্তেগাসাহ সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, সে যেসব বিষয়ে কেবল আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট ফরিয়াদ করা যায় না সেসব বিষয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে ফরিয়াদ করা বৈধ বলেন। সে এ বিষয়ে একটি কিতাবও লিখেছে। আর সে বলতো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েবের সকল চাবির জ্ঞান রাখেন যার জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রাখে না।

তাঁর মতো আরেকজন থেকে তিনি বর্ণনা করেন, যে শিক্ষকতা করতো এবং তাকে ফতোয়াদাতা বলা হতো সে বলতো, আল্লাহ যা জানেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা জানেন এবং আল্লাহ যা করতে সক্ষম তিনিও তা করতে সক্ষম। তাঁর মৃত্যুর পর এ গোপন রহস্যটি হাসানের নিকট স্থানান্তরিত হয়, অতঃপর হাসানের বংশধারা হয়ে তা আবুল হাসান শাযিলীর পর্যন্ত স্থানান্তরিত হয়।

তারা বলে, এটি হলো সমগ্র গুণেগুনান্বিত সত্তা গাউস কুতুবের স্থান। তাদেরই কেউ আল্লাহর বাণী সম্পর্কে বলে,

আর সকাল-সন্ধ্যায় তোমরা তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর।

সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ৯

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সকাল-বিকাল পবিত্রতা ঘোষণা করেন।

তাদের কেউ বলে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইবাদাত করি। ফলে তারা রাসূলকে মা'বূদ বানাতো।

আমি বলি, বূসিরী বলেছে:

নিশ্চয়ই আপনার অনুগ্রহেই দুনিয়া ও তার সতীন (আখেরাত)। আর আপনার জ্ঞানসমূহের কিয়দংশই হলো লূহ ও কলমের জ্ঞান।

তিনি দুনিয়া ও আখিরাতকে তার দান বলেই আখ্যায়িত করলেন। তিনি নিশ্চিত করলেন যে, তিনি লাওহে মাহফূযে যা রয়েছে তা জানেন। আর এ বক্তব্যই শাইখুল-ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) ঐ শিক্ষক থেকে বর্ণনা করেছেন। এর সবই সুস্পষ্ট কুফর।

আশ্চর্য ব্যাপার হলো শয়তানই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ভালোবাসা এবং তাঁর সম্মান ও অনুসরণের রূপে তাদের সামনে এগুলো তুলে ধরেছে। এটিই হলো অভিশপ্তের কাজ। কারণ, তার আবশ্যক কাজই তো হলো সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলিয়ে সকল ডাকে সারাদানকারী পশুরূপীদের মাঝে চালু করা। যারা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত নয় এবং যারা শক্ত কোন খুঁটির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেনি। কারণ এটি সম্মান নয়। সম্মানের মূল স্থান হলো অন্তর, মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আর তারা তার থেকে সবচেয়ে দূরে। কারণ, অন্তরের সম্মান হলো তাঁকে বান্দা ও রাসূল বিশ্বাস করার পরবর্তী ধাপ, যেমন তাঁর ভালোবাসাকে নিজের জীবন, পিতা-মাতা, সন্তান ও সকল মানুষের ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দেয়া। আর এ মহব্বতকে সত্যারোপ করে দু'টি জিনিস:

দুটির একটি: তাওহীদকে ভেজাল মুক্ত করা। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে ভেজাল মুক্ত করার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিলেন। ফলে তিনি সব দিক থেকে শির্কের কারণসমূহ ও তার মাধ্যমগুলো নির্মূল করেছেন। এমনকি জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলল: আল্লাহ ও আপনি যা চেয়েছেন। তিনি বললেন:

তুমি কি আমাকে আল্লাহর শরীক বানালে?! বরং আল্লাহ একাই যা চেয়েছেন।

এটি আহমাদ বর্ণনা করেন। তিনি গাইরুল্লাহর নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি জানিয়ে দেন যে, এটি শির্ক। আর তিনি কবরের দিকে সালাত আদায় বা কবরকে মসজিদ বানাতে অথবা মেলার জায়গা বানাতে অথবা কবরের উপর বাতি জ্বালাতে নিষেধ করেন। বরং তাঁর দীনের ভিত্তিই হলো এ মূল নীতির উপর যা নাজাতের যাঁতার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি যেভাবে স্বীয় কথা, কাজ ও তাওহীদ বিরোধী মাধ্যমসমূহ বন্ধের মাধ্যমে সেটিকে সাব্যস্ত করেছেন তা আর কেউ করেননি। অতএব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্মান (তাওহীদের ক্ষেত্রে) তাঁকে অনুসরণ দ্বারা হয়, তাঁর বিধোধিতা দ্বারা হয় না।

দ্বিতীয়টি হলো, ধর্মের মূল ও শাখাগুলোর সকল সূক্ষ্ম ও অসূক্ষ্ম বিষয়ে তাঁকে এককভাবে বিচারক মনে করে তাঁর খাঁটি অনুসরণ করা। উপরন্তু তাঁর বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে সেটিকে মাথা পেতে মেনে নেয়া এবং তার বিরোধী ও বিপরীত মত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করা। যাতে তিনিই হন একক ফায়সালাকারী যাঁর কথা গ্রহণ ও অনুসরণ করা হয় এবং যার বিপরীতটি প্রত্যাখ্যান করা হয়। যেমনিভাবে তাঁর প্রতিপালক হচ্ছেন একক মা'বূদ, পূজ্য ও স্রষ্টা, যাঁর নিকট ফরিয়াদ করা হয়, যাঁর উপর ভরসা করা হয়, যাঁর নিকট আশা ও যাঁকে ভয় করা হয়, গুনাহ মাফ ও বিপদ দূর করার জন্য যাঁর নিকট এককভাবে আশা করা হয়, যাঁর দানই হলো দুনিয়া ও আখিরাত, যিনি সকল সৃষ্টিকে এককভাবে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে এককভাবে রিযিক দিচ্ছেন, এককভাবে তাদের পুনরুত্থান করবেন, যিনি ক্ষমা ও দয়া করেন, হিদায়েত দেন ও পথভ্রষ্ট করেন, যিনি এককভাবে কাউকে ভাগ্যবান ও দুর্ভাগা করেন। এসব ব্যাপারে অন্য কারো কোন ক্ষমতা নেই। সে যেই হোক না কেন। না নবী, না জিব্রীল, না অন্য কেউ। এটিই হলো সত্যিকারের সম্মান যা সম্মানিত সত্তার অবস্থা মাফিক। যা সম্মানকারীর দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের জন্য উপকারী এবং যা তার ঈমানের জন্য বাধ্যতামূলক ও আবশ্যক। আর মুখের সম্মান হলো তাঁর যথোপযুক্ত প্রশংসা করা যেভাবে তাঁর প্রতিপালক ও তিনি নিজের প্রশংসা করেছেন, যাতে কোন বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি নেই। যেমন করেছে কবরপূজারীরা। কারণ, তারা তাঁর প্রশংসায় চরম বাড়াবাড়ি করেছে। আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্মান হলো তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর দীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা। তাঁর আনীত ধর্মের সাহায্য করা ও তাঁর বিরোধীদের সাথে জিহাদ করা।

মোট কথা, উপকারী সম্মান হলো তাঁর দেয়া সংবাদকে বিশ্বাস করা, তাঁর আদেশের আনুগত্য করা, তাঁর নিষিদ্ধ ও তিরস্কৃত বিষয় থেকে বিরত থাকা, তাঁর জন্য শত্রুতা ও মিত্রতা এবং ভালোবাসা ও ঘৃণা করা। তাঁকে এককভাবে ফায়সালাকারী মানা, তাঁর বিচারে সন্তুষ্ট থাকা এবং তিনি ছাড়া কোন তাগূতকে মেনে না নেয়া, যার নিকট ফয়সালা নিয়ে যাওয়া হয়, বরং যা তাঁর কথার মাফিক হবে তা গ্রহণ করবে। আর যা তাঁর কথার বিরোধী হবে তা প্রত্যাখ্যাত করবে, বা বিশ্লেষণ করবে বা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। আল্লাহ সাক্ষী আর তিনি সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট এবং তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর রাসূলগণ ও আওলিয়ায়ে কিরাম এ ব্যাপারে সাক্ষী যে, তাওহীদপন্থীদের বিরোধী কবরপূজারীরা এমন নয়। আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই।

এটি হলো শাইখুল-ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) এর কথা। তিনি তাঁর যুগের ও পূর্বের এমন কিছু তাওহীদের ব্যাপারে মূর্খ জাতির বর্ণনা দিয়েছেন যারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ভালোবাসার দাবি করে তাঁর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছে। এমনকি তারা তাঁকে এমন কিছু বিশেষণে বিশেষিত করেছে যেগুলোর উপযুক্ত আল্লাহ ছাড়া কেউ নয়। যেমন: ক্ষমতা, জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণ। এমনকি তারা তাঁর জন্য আল্লাহর খাঁটি অধিকারও ব্যয় করে। যেমন: দু'আ, আশা, তাঁর দিকে সকল ব্যাপারকে সোপর্দ করা ও তাঁর উপর ভরসা করা। শাইখ সুলাইমান (রাহিমাহুল্লাহ) কিতাবুত-তাওহীদের ব্যাখ্যা গ্রন্থের ১৮৬ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রশংসায় যারা বাড়াবাড়ি করেছে তাদের কিছু কথা উল্লেখ করেছেন। তেমনিভাবে তিনি বূসিরীর বুরদাহ নামক কবিতার কিছু পংক্তি উল্লেখ করেছেন। যেমন: তার কথা,

হে সম্মানিত সৃষ্টি! আমার আর কে আছে ব্যাপক বিপদ আসলে আমি আপনাকে ছাড়া যার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি।

এর পরের আরো কয়েকটি পংক্তি। এরপর তিনি তাতে থাকা সুস্পষ্ট শির্কের বর্ণনা দেন। আর তিনি আল-বারায়ীর কিছু কবিতাও উল্লেখ করেন যাতে সে প্রচুর অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করেছে এবং স্বীয় রবকে ভুলে সুস্পষ্টভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইবাদাতে পতিত হয়েছে। অনুরূপভাবে না'মী "মা'আরিযুল-আলবাব"

নামক কিতাবের ১৬৯ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে বাড়াবাড়িকারীদের কিছু কথা ও মৃতদের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে তাদের কিছু অতিরঞ্জনের কথাও উল্লেখ করেছেন। তম্মধ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সুস্পষ্ট শিরক সম্বলিত কিছু পংক্তিও রয়েছে। যেগুলোর শুরু হলো তার কথা:

হে আমার মনিব! হে দীনের নির্যাস! হে আমার নির্ভরতার জায়গা! হে আমার ভরসা! বরং হে আমার ভাণ্ডার! এবং হে আমার গর্ব!

আমি যে বস্তুর প্রয়োজনের আশঙ্কা করছি সে ব্যাপারে আপনিই আমার আশ্রয়স্থল। এমনকি আপনি দুনিয়ার বিপদের ক্ষেত্রেও আমার আশ্রয়স্থল।

এ জাতীয় আরো অনেকগুলো শির্কী কবিতা। তিনি এগুলোর ব্যাপারে এভাবে টিকা লিখেন যে, আমি জানি না এ চাওয়ার ধরণ ও উদ্দেশ্য হাসিল করার অবস্থার পর স্রষ্টা কোন অর্থে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে) আলাদা বৈশিষ্টের অধিকারী থাকলো?!

এ খবীস মুশরিক শিরকের আর কোন্ বিষয়টিই বাকি রাখলো?! কারণ, মূর্তিপূজারী মুশরিকরাও আল্লাহ ছাড়া তারা যেগুলোর ইবাদাত করে তাদেরকে এর কিংবা এর চেয়ে ছোট বস্তুরও উপযুক্ত করে না।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ উম্মতের ব্যাপারে এ ধরনের বাড়াবাড়ির আশঙ্কা করেছেন এবং তিনি তাদেরকে এর কারণগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আবু দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) একটি সুন্দর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনুশ-শিখখীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

একদা আমি বনু আমিরের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে বললাম: আপনি হলেন আমাদের মনিব। তখন তিনি বললেন: মনিব হলেন আল্লাহ তা'আলা। আমরা বললাম: আপনি হলেন আমাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ও মহান ব্যক্তি। তখন তিনি বললেন: তোমরা এ কথা বলতে পারো বা এর কিছুটা।

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত:

কিছু লোক বললো: হে আল্লাহর রাসূল! হে আমাদের সর্বোত্তম ও সর্বোত্তমের ছেলে! হে আমাদের নেতা ও আমাদের নেতার ছেলে! তখন তিনি বললেন: হে মানুষ! তোমরা নিজেদের কথা বলে যাও। তবে শয়তান যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করে। আমি হলাম মুহাম্মাদ, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে অবস্থানে রেখেছেন তা থেকে তোমরা আমাকে আরো উপরে উঠাবে সেটা আমি পছন্দ করি না।

নাসায়ী উক্ত হাদীসটিকে সুন্দর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের ভাণ্ডারে এ জাতীয় অনেক বর্ণনা রয়েছে। যেমন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী:

নিশ্চয়ই আমার কাছে কোন কিছুর ফরিয়াদ করা যাবে না। কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই ফরিয়াদ করা যাবে।

ত্বাবরানী এটি বর্ণনা করেছেন।

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বললেন:

আল্লাহ যা চেয়েছেন ও আপনি যা চেয়েছেন। তিনি বললেন: "তুমি কি আমাকে আল্লাহর সদৃশ বানালে? বরং আল্লাহ একাই যা চেয়েছেন:

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকল সৃষ্টির নেতা, তাদের মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। কিন্তু তিনি প্রশংসাকে অপছন্দ করতেন বিশেষ করে প্রশংসিতের সামনে। এমনকি তিনি বলেন:

যখন তোমরা প্রশংসাকারীদের সাক্ষাত পাবে, তাদের চেহারায় মাটি ছিঁটিয়ে দাও।

মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটির কারণ সম্মুখ প্রশংসা প্রশংসিতকে অহমিকা ও অহঙ্কারে ফেলে দেয়, যা আমলগুলোকে নষ্ট করে দেয় অথবা তা তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ রবের গোলামিতে গর্ববোধ করতেন। সেটি হলো তাঁর সামনে লাঞ্ছিত ও অবনত হওয়া। এটি মূলত সম্মান ও ফযীলতের ব্যাপার। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীতে বান্দা বলে তাঁকে উল্লেখ করেছেন:

"তোমরা যদি আমার বান্দার উপর নাযিলকৃত কুর'আনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে থাকো

সূরা আল-বাক্বারাহ: আয়াত: ২৩

তাঁর আরেকটি বাণীতে:

“পবিত্র সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিভ্রমণ করিয়েছেন।

সূরা আল-ইসরা: আয়াত: ১

তাঁর আরেকটি বাণীতে:

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন”।

সূরা আল-কাহফ: আয়াত: ১

এবং তার বাণী:

“আর নিশ্চয়ই যখন আল্লাহর বান্দা দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকছিলো”।

সূরা আল-জিন: আয়াত: ১৯

কারণ, আল্লাহ তা‘আলার গোলামি চায় চরম লাঞ্ছনা ও চূড়ান্ত ভালোবাসা। আর আল্লাহর জন্য লাঞ্ছনা দাবি করে নতিস্বীকার, ভয় ও আল্লাহর জন্য অবনত হওয়া এবং নিজকে নিচু, নিন্দিত ও তাঁর দেয়া দায়িত্বে ত্রুটিকারী মনে করা। ফলে সে নিজকে তিরস্কার করবে এবং নিজ রবের দয়া ও অনুগ্রহের কথা স্বীকার করবে। অনুরূপভাবে তাঁর ভালোবাসার দাবি হচ্ছে এমন কথা, কাজ ও ইচ্ছাকে ভালোবাসা বা ঘৃণা করা যেগুলোকে আল্লাহ ভালোবাসেন বা ঘৃণা করেন। ফলে এরই মাধ্যমে রব্বুল-আরবাব তথা আল্লাহর গোলামির পূর্ণতার প্রকাশ ঘটবে।

পঞ্চমতঃ তাঁর মৃত্যু অন্যান্য রাসূল ও নবীদের মৃত্যুর ন্যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

“নিশ্চয়ই তিনিও মরবেন এবং তোমরাও মরবে।

সূরা আয-যুমার: আয়াত: ৩০

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

আর আপনার পূর্বে কোন মানুষকে আমরা স্থায়ী জীবন দান করিনি; সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি অনন্ত জীবনসম্পন্ন হয়ে থাকবে?

সূরা আল-আম্বিয়া: ৩৪-৩৫

সব মুসলমান এ কথা মানে যে, নিশ্চয়ই পূর্বেকার সব নবী মৃত্যু বরণ করেছেন এবং আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের জন্য দুনিয়াতে যতটুকু জীবন নির্ধারণ করেছেন তা শেষ হয়ে গিয়েছে। ফলে তাঁরা এখন বারযাখী জগতের অধিবাসী। যেহেতু কুর‘আনের উদ্ধৃতি শহীদদের জীবন আছে বলে দাবি করে যেমন: আল্লাহর বাণী:

আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তাদেরকে রিযিক দেয়া হয়।

সূরা আ-ল-ইমরান: আয়াত: ১৬৯

তাহলে নবীগণ এ জীবনের আরো বেশি উপযুক্ত। আবার এ কথাও সবার জানা যে, শহীদগণ এ দুনিয়ার জীবন থেকে বেরিয়ে গেছেন এবং তাঁদের সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করা হয়েছে, তাঁদের স্ত্রীরা অন্যদের জন্য হালাল হয়ে গিয়েছে। এটি তাঁদের মৃত্যুর সুস্পষ্ট দলীল। অথচ আল্লাহ তা‘আলা তাঁদেরকে তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে মৃত বলতে নিষেধ করেছেন:

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।

সূরা আল-বাকারাহ: আয়াত: ১৫৪

এ জীবনের ধরন আমরা জানি না। তবে আমরা এ কথা নিশ্চিত জানি যে, তাদের রূহগুলো তাদের শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে, তাদের বয়সও শেষ হয়ে গিয়েছে এবং তাদের আমলগুলোও খতম হয়ে গিয়েছে। বিশুদ্ধ হাদীসে তাদের জীবনের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে, তাদের রূহগুলোকে সবুজ পাখির পেটে রাখা হয়েছে। আর সেগুলো জান্নাতের গাছে ঝুলে আছে। এ বর্ণনা এ কথা নিশ্চিত করে যে, তাদের রূহগুলো তাদের শরীরগুলোকে ছেড়ে গিয়েছে। তারা এ বিশেষ জীবন দ্বারাই বিশেষিত হয়েছে।

আর এ কথা জানা যে, নবী ও রাসূলগণ সর্বাবস্থায় এ জীবনের বেশি উপযুক্ত। তবে এ জীবন তাদেরকে কারো ডাকে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা দেয় না এবং না কারো আবেদনে কোন কিছু দেয়ার সুযোগ দেয়। তাই আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর নবী বারযাখী জীবনে রয়েছেন, যা শহীদদের জীবনের চেয়ে আরো পরিপূর্ণ। তবে তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর শরীরটি জীর্ণ শীর্ণ হওয়া থেকে বাঁচবে। যেমন: আবু দাঊদের সূত্রে আউস ইবনু আউস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমু'আর দিন। সুতরাং তোমরা সেদিনে বেশি বেশি আমার উপর দরূদ পাঠাও। কারণ, তোমাদের দরূদগুলো আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়। সাহাবায়ে কিরাম বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! কীভাবে আপনার নিকট উপস্থাপন করা হবে; অথচ আপনার হাড়গুলো তখন জীর্ণশীর্ণ হয়ে যাবে? তিনি বললেন: আল্লাহ তা'আলা যমীনের ওপর নবীদের শরীর খাওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন।

এ হাদীসটি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল যে, তাঁর রূহ তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে এবং সেটিকে সুদূর উপরের বন্ধু তথা আল্লাহর নিকট উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। যেমন তা ছিলো দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায় নেয়ার সময়কার শেষ আবেদন।

তেমনিভাবে হাদীসে আবু হুরাইরাহর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীটি বর্ণিত হয়েছে যে,

"কোন মুসলমান আমার উপর সালাম দিলে আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট আমার রূহটি ফেরত দেন যাতে আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি"।

এটি আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন।

এ উত্তর দেয়ার ধরনে মতভেদ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে ভালো জানেন। আবু দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) একটি হাসান সূত্রে আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না, আর আমার কবরকে ঈদ বা মেলায় পরিণত করো না এবং তোমরা আমার ওপর দুরূদ পড়ো। কারণ, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের দুরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।

হাফিয যিয়া মুখতারাহ নামক কিতাবে এবং অন্যরা আলী ইবনু হুসাইন ইবনু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা জনৈক ব্যক্তিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কবরের একটি ফাঁকা জায়গায় ঢুকে সেখানে দু'আ করতে দেখলে তিনি তাকে নিষেধ করেন এবং তিনি বলেন: আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি হাদীসের কথা বলবো না যা আমি আমার পিতার সূত্রে আমার নানা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শুনেছি। তিনি বলেন:

তোমরা আমার কবরকে ঈদ বা মেলায় পরিণত করো না। আর তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না। কারণ, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌঁছে যায়।

আর সা'ঈদ ইবনু মানসূর বলেন: আব্দুল-আযীয ইবনু মুহাম্মাদ আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, সুহাইল ইবনু আবী সুহাইল আমাকে সংবাদ দিলেন যে, একদা হাসান ইবনু হাসান ইবনু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) আমাকে কবরের পাশে দেখলে তিনি আমাকে ডেকে বললেন: কী হলো, আমি তোমাকে কবরের পাশে দেখছি কেন? আমি বললাম: আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সালাম দিয়েছি। তিনি বললেন: যখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সালাম দিবে। অতঃপর তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

তোমরা আমার কবরকে ঈদ বা মেলাক্ষেত্রে পরিণত করো না। আর তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না। বরং তোমরা যে কোন জায়গা থেকে আমার উপর দরূদ পাঠ করো। কারণ, তোমরা যেখানেই থাকো না

কেন তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়। ইহুদিদের উপর আল্লাহর লা'নত পড়ুক যারা নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। তোমরা ও উনদুলুসের অধীবাসী সবাই এ ক্ষেত্রে সমান।

এসব বর্ণনা প্রমাণ করে যে, (তার নিকট সালাম পৌঁছার) বিষয়টি সালাফদের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল এবং তারা এ সুন্নাতটির হিফাযত ও প্রচারে খুব আগ্রহী ছিলেন। আর তার বাণীর অর্থ:

তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকে কবর বানিয়ো না।

অর্থাৎ, সালাত আদায়, দু'আ ও কুর'আন তিলাওয়াত করা থেকে তোমরা ঘরকে বিরান বানিয়ো না। ফলে তা কবরের মতো হবে, যেখানে সালাত আদায় করা জায়েয নয়। এখানে উদ্দেশ্য নফল সালাত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী: তোমরা আমার কবরকে ঈদ বা মেলায় পরিণত করো না। এখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশেষভাবে ও নির্দিষ্ট জমায়েতের ঘটন করে তাঁর কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন। যাতে তা ঈদে পরিণত না হয়। যেখানে নির্দিষ্ট সময়ে মানুষ বারবার একত্রিত হয় এবং সেখানে খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়। যা প্রত্যেক বছর একবার বা কয়েকবার ঘুরে আসে। অতঃপর তিনি আমাদেরকে সংবাদ দিলেন যে, আমরা যেখানেই থাকিনা কেন আমাদের দরূদগুলো তাঁর নিকট পৌঁছে যায়। অর্থাৎ, দূর ও কাছ থেকে তাঁর নিকট সালাত ও সালাম পৌঁছানো যায়। অতএব, কবরের পাশে গিয়ে তাঁকে সালাত ও সালাম দেয়ার কোন বিশেষত্ব নেই। এটিই হলো হাসান ইবনু হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) এর কথার অর্থ। তিনি বলেছিলেন, তোমরা ও উনদুলুসবাসীরা একই সমান।

সুতরাং যে ব্যক্তি শুধু সালাম দেয়ার ইচ্ছায় কবরের কাছে গেলো; তার উদ্দেশ্য মসজিদ নয় তাহলে সে কবরকে ঈদে পরিণত করলো। যেমনটি হাসান ইবনু হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বুঝেছেন।

ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) মদীনাবাসীদের জন্য এ ব্যাপারটি অপছন্দ করতেন যে, যখনই কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই সে নবীর কবরের পাশে আসবে। কারণ, সালাফরা এমন করতেন না। তিনি বলেন: এ উম্মতের শেষ ভাগকে তাই শুদ্ধ করবে যা তার প্রথম ভাগকে শুদ্ধ করেছিল। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীরা অধিকাংশ সময় খুলাফায়ে রাশিদীনের পেছনে মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করে সালামের পর নিজেদের গন্তব্যে চলে যেতেন অথবা বসে বসে কুর'আন তিলাওয়াত ও ইবাদাত করতেন। প্রত্যেক সালাতের পর কবরের নিকট যাওয়া তাঁদের কাছ থেকে সংরক্ষিত হয়নি। বরং তাঁরা তাশাহহুদের মধ্যেই সালাত ও সালাম বলে যথেষ্ট করতেন। আর এটি কবরের পাশে দাঁড়ানোর চেয়ে উত্তম। অথচ তাঁরা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর জীবদ্দশায় ও তারপরে ওলীদ ইবনু আব্দিল-মালিকের যুগে মসজিদের বাড়তি অংশে কবরকে ঢুকানোর পর কবরের চতুষ্পার্শ্বে দেয়াল নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত কবরের নিকট পৌঁছুতে পারতেন। বস্তুত সাহাবায়ে কিরাম সর্বাবস্থায় কবরের পাশে গিয়ে সালাত ও সালামে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁদের কেউ কেউ বাইরের সফর থেকে আসলে তাঁকে সালাম দিয়ে চলে যেতেন, যেমন ইবনু উমর থেকে বর্ণিত। অন্য কোন সাহাবী থেকে তা সংরক্ষিত নয়। আর তিনিও তা সর্বদা করতেন না। সুতরাং তা সর্বদা বারবার করা বিদ'আত এবং আল্লাহর পাশাপাশি তাঁর কাছে কিছু চাওয়া ও তাঁকে সম্মান করার বাহনও বটে।

ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সালাম দিয়ে তার নিজের জন্য দু'আ করতে চায় সে যেন কবরমুখী না হয়ে বরং কিবলামুখী হয়, যা দিকসমূহের উত্তম দিক ও দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনাময়। তবে ইমাম মালিক থেকে একটি কাহিনী বর্ণিত, তিনি খলীফা মানসূরকে বললেন, কেন আপনি কবরের দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে নিচ্ছেন? বরং আপনি কবরমুখী হয়ে তাঁর সুপারিশ কামনা করুন— এটি একটি মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনী। যেমনটি উলামায়ে কিরাম অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন।

ষষ্ঠতঃ শুধু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কবর যিয়ারতের জন্য সফরকে নিষেধ করা।

সিহাহ, সুনান ও মাসানীদে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেন:

"তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফরের বন্দোবস্ত করা যাবে না: মসজিদুল-হারাম, আমার এ মসজিদ ও মসজিদে আক্বসা"।

এর মানে হলো, ইবাদাতের উদ্দেশ্যে কোন জায়গা বা ভূখণ্ডের দিকে এ বিশ্বাসে সফর করা নিষেধ যে তাতে আমল করলে বহুগুণ সাওয়াব পাওয়া যাবে অথবা অন্য জায়গার উপর এর বিশেষত্ব রয়েছে। এ নিষেধের মধ্যে রয়েছে কবরসমূহের উদ্দেশ্যে যদিও তা নবীগণের কবর হয় সফর করা। কারণ, এটি সেগুলোকে ঈদ বা মেলাক্ষেত্র বানানোর সামিল। আর এটি কবরবাসীদের মাঝে এমন কিছু বিশ্বাস করার সামিল যা আল্লাহর পাশাপাশি তাদের ইবাদাতের কারণ হয়। যেমনটি এ যুগের ও পূর্ব যুগের মুশরিকদের মধ্যে ঘটেছে। যেমন তারা

তাদের ধারণা মতে তথাকথিত ওলীদের কবরে যাওয়ার জন্য লম্বা লম্বা সফর করে, অনেক কষ্টক্লেশ সহ্য করে ও প্রচুর সম্পদ খরচ করে। যখন তারা এ সব মাজারে পৌঁছায় তখন তারা সেখানে তারা তাদের বাহনকে থামায় এবং তারা এ সব মৃতদের চিৎকার ও ডাকাডাকি আরম্ভ করে। তারা সেখানে এমন কিছু আমল করে যা আল্লাহ রাব্বুল-আলামীন ছাড়া আর কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন কবরগুলোর তাওয়াফ করা, সেগুলোর মাটি হাত দিয়ে মাসেহ করা, তাদের কাছে দু'আ করা এবং তাদের জন্য যবেহ ও কুরবানী করা ইত্যাদি।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনিটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফর করার নিষেধাজ্ঞার ভেতর এটিই আশঙ্কা করেছেন।

এ ব্যাপারে শাইখুল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) একটি পুস্তিকা রচনা করেন। সেখানে শুধু নবী ও নেককারদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার বিধান সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ তুলে ধরেন। তিনি নিষিদ্ধ হওয়াকে প্রাধান্য দেন। তিনি ইবনু বাত্তা, আবুল-ওয়াফা ইবনু আক্বীল, জুওয়াইনী, কাজী ইয়ায ও অন্যদের এটিই মত ছিল উল্লেখ করেন। বরং এটি অধিকাংশ আলিমেরই কথা। ইমাম মালিক তাই স্পষ্ট করে বলেছেন। ইমামগণ থেকে কেউ তাঁর বিরোধিতা করেননি। তবে এর অর্থ এ নয় যে, সফর করা ছাড়া হলেও কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ। বরং হাদীসে এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং এটি আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। একজন যিয়ারতকারী মৃতদের জন্য দু'আ ও রহমত প্রার্থনা করে। আর এটি তার নিকটস্থ কবরস্থানেই পালন করা যায়। কারণ, কোন এলাকা কবরস্থান থেকে খালি নয়। কিন্তু দূর দেশের কোন কবর কিংবা ভূখণ্ডের জন্য যানবাহন প্রস্তুত ও সফর করা সাধারণত কবরস্থ ব্যক্তি মহান এবং তাকে সম্মান করা, তাকে ডাকা ও তার নিকট কিছু আশা করা যায় বিশ্বাস থেকে হয়। ফলে সে তার জন্য খাঁটি ইবাদাত সমর্পণ করে। অতএব তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফর করার নিষেধাজ্ঞা এসেছে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

ইমাম আহমাদ ও অন্যরা ইবনু উমর ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা ত্বর পাহাড়ে সালাত আদায়ের জন্য সফর করতে নিষেধ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সফর করা নিষেধের হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা ত্বর পাহাড়ের কথা উল্লেখ করে সেটিকে পবিত্র উপত্যকা ও বরকতময় ভূখণ্ড বলে আখ্যায়িত করেন এবং সেখানেই তাঁর বান্দা মূসা (আলাইহিস-সালাম) এর সাথে তিনি কথা বলেন।

অতএব, যে ব্যক্তি মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে মদীনায় সফর করে যাতে এক ওয়াক্ত সালাত আদায় এক হাজার সালাত আদায়ের সমান হয়, তার সফরটি ইবাদত ও নৈকট্য লাভের কারণ হবে। তবে মসজিদে সালাত আদায়ের পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সাহাবায়ে কিরাম এবং শহীদদের কবরে গিয়ে সালাম ও তাদের জন্য দু'আ করা বৈধ।

কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু কবরের উদ্দেশ্যে সফর করে তার ওপর সালাম বা তার নিকট দু'আ করার জন্যে, তার সফরটি নিকৃষ্ট বিদ'আত। কারণ, সে হাদীসের বিরোধিতা করল।

তোমরা আমার কবরকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা আমার ওপর দরূদ পড়। কারণ, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।

কবর শরীফের যিয়ারতের ফযীলত সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীসগুলোর সবই দুর্বল বা বানোয়াট। যেমনটি আলেমগণ বিশ্লেষণ করেছেন। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

পঞ্চম অধ্যায়:

দু'টি সাক্ষীর শর্তসমূহ:

আলেমগণ ইখলাসের কালিমার সাতটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ ছন্দাকারে পেশ করেছেন এভাবে:

জ্ঞান, বিশ্বাস, নিষ্ঠা, তোমার সত্য বলা এবং আরও রয়েছে মুহাব্বত। আর আনুগত্য করা ও তা গ্রহণ করা।

এ শর্তগুলো কুর'আন ও সুন্নাহর দলীল ঘাঁটাঘাঁটি ও খোঁজাখুঁজি করে বের করা হয়েছে। কেউ কেউ তার সাথে অষ্টম শর্ত যোগ করে এভাবে কবিতা লিখেছেন:

এগুলোর সাথে অষ্টম শর্তটি বাড়ানো হয়েছে যা হলো আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য শরীকদেরকে অস্বীকার করা যাদেরকে পূজা করা হয়।

তিনি এ শর্তটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিম্নোক্ত বাণী থেকেই নিয়েছেন:

“যে ব্যক্তি বলল আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা’বূদ নেই এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবূদকে অস্বীকার করলো, তার জান ও মাল হারাম হয়ে গেলো।

মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল-ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তাওহীদ নামক কিতাবে এ হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন: এটি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর অর্থ বর্ণনাকারী একটি মহান হাদীস। কারণ, এটি শুধু মুখে বলাকে কারো জান ও সম্পদের রক্ষাকারী নির্ধারণ করেনি, বরং মুখে বলার সাথে তার অর্থ জানা ও তা স্বীকার করাকেও যথেষ্ট করেনি এবং সে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকে না যার কোন শরীক নেই এতেও যথেষ্ট করেনি, যতক্ষণ না তার সাথে আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যকে অস্বীকার করা যোগ না করবে। যদি সন্দেহ বা দ্বিধা থাকে তাহলে তার রক্ত ও সম্পদ নিরাপত্তা পাবে না।

এ শর্তের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কারো ইবাদাত বাতিল হওয়া বিশ্বাস করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিরেট অধিকারের কোন কিছু অন্যের জন্য ব্যয় করবে সে সত্যিই পথভ্রষ্ট মুশরিক। আর আল্লাহ ছাড়া যত মা’বূদ রয়েছে যেমন: কবর, গম্বুজ, ভূখণ্ড ইত্যাদি তা সবই মুশরিকদের মূর্খতা ও কুসংস্কার থেকে তৈরি হয়েছে। সুতরাং যে তাদের এগুলোকে স্বীকার করবে অথবা তাদের সততার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগবে কিংবা তারা যার ওপর আছে তা বাতিল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করবে সে অবশ্যই তাওহীদপন্থী নয়। যদিও সে মুখে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে এবং যদিও সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করে।

এদত সত্বেও সাতটি শর্তই দা’ওয়ার ইমামগণের কিতাবসমূহে প্রসিদ্ধ। তাই স্পষ্ট করার জন্য তার ওপর কতক দলীল উল্লেখ করবো:

প্রথম শর্ত: জ্ঞান

এর দলীল হলো আল্লাহর বাণী:

“অতএব, তুমি জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা’বূদ নেই”।

সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৯

মুসলিম উসমান —রাদিয়াল্লাহু আনহু— থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ —সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম— বলেছেন:

“যে মারা গেল, এবং সে জানে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা’বূদ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে”।

উদ্দেশ্য হচ্ছে: সাক্ষী দু’টির অর্থ এবং সাক্ষী দু’টি যে আমল আবশ্যক করে তার সম্পর্কে সত্যিকার ইলম। আর ইলমের বিপরীত হচ্ছে মূর্খতা। এ মূর্খতাই এ উম্মতের মুশরিকদেরকে তার অর্থের বিরোধিতায় লিপ্ত করেছে। ফলে তারা “ইলাহ” এর অর্থ এবং অস্বীকার করা ও সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুর্খ রয়ে গেছে। এবং এ কালিমা দ্বারা উদ্দেশ্য তার অর্থ এটিও তাদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে। বস্তুত কালিমার অর্থ সম্পর্কে জ্ঞানী মুশরিকরা তার অর্থেরই বিরোধিতা করেছে, যেমন তারা বলেছে:

“সে কি সকল মা’বূদকে বাদ দিয়ে এক মা’বূদকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়”।

সূরা স্বাদ, আয়াত: ৫

আর তারা বলে:

“তোমরা চলো এবং নিজেদের মা’বূদগুলোর ব্যাপারে ধৈর্য ধরো”।

সূরা স্বাদ, আয়াত: ৬

দ্বিতীয় শর্ত: বিশ্বাস:

আর তার বিপরীত হলো সন্দেহ ও নিরবতা অবলম্বন করা, অথবা শুধু ধারণা ও সন্দেহ করা।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দু'টি সাক্ষী (শাহাদাতাইন)কে স্বীকার করলো, তাকে অবশ্যই স্বীয় অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে এবং সে যা বলছে তার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে, যেমন আল্লাহ ইলাহ হওয়ার একমাত্র হকদার এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত বিশুদ্ধ এবং আল্লাহ ছাড়া যে কোন ইলাহের ইলাহ হওয়া এবং কোন ব্যক্তি নবুওতের দাবি করলে তার কথা বাতিল হওয়ার বিশ্বাস তার মধ্যে থাকতে হবে। যদি কেউ তাঁর (কালিমার) অর্থের বিশুদ্ধতায় সন্দেহ করে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত বাতিল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকে, তাহলে এ দু'টি সাক্ষ্য তার কোন কাজে আসবে না।

এ শর্তের দলীল: মুসলিম আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি শাহাদাতাইন সম্পর্কে বলেন:

"এ দু'টি সাক্ষ্য নিয়ে নিঃসন্দেহে কোন বান্দা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।

তার থেকে বিশুদ্ধ গ্রন্থে আরও রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন:

"এ দেয়ালের পেছনে যার সাথে তুমি সাক্ষাত করবে, যে অবস্থায় সে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই, তুমি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও"।

আল্লাহ তা'আলা এ বলে মু'মিনদের প্রশংসা করেন,

"নিশ্চয়ই সত্যিকার মু'মিন ওরা যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছে অতঃপর তাতে তারা কোন ধরনের সন্দেহ করেনি"।

সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৫

তিনি মুনাফিকদেরকে এ বলে নিন্দা করেছেন যে,

"তাদের অন্তরগুলো সন্দেহের রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তাই তারা নিজেদের সন্দেহের মাঝে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে"।

সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৪৫

ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

"ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক। আর একীন পুরোটাই ঈমান"।

নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি শাহাদাতাইনের অর্থকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই তার অঙ্গগুলো এক রবের ইবাদাতে ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আনুগত্যে উজ্জীবিত হবে।

তৃতীয় শর্ত: কবুল করা যা প্রত্যাখ্যান করার বিপরীত:

দুনিয়াতে এমন ব্যক্তিও আছে যে শাহাদাতাইনের অর্থ জানে এবং সেগুলোর অর্থে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। তবে সে অহঙ্কার ও হিংসাবশতঃ সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে। এটিই ছিলো ইহুদি ও খ্রিস্টান আলিমদের অবস্থা। তারা এক আল্লাহর ইবাদাতে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নিজেদের সন্তানদের ন্যায় চিনেছে এতদসত্ত্বেও তারা তাঁকে গ্রহণ করেনি।

"তাদের নিকট সত্য প্রকাশ হওয়ার পরও নিজেদের হিংসা বশতঃ।

সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১০৯

এভাবেই মুশরিকরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সততা জানতো। তবে তারা অহঙ্কারবশতঃ তা কবুল করা হতে বিরত থাকতো। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"নিশ্চয়ই তাদেরকে যখন বলা হতো, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই তখন তারা অহঙ্কার দেখাতো"।

সূরা আস-সাফফাত: আয়াত: ৩৫

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

"নিশ্চয়ই তারা সত্যিই আপনার অবিশ্বাস করে না। তবে তাদের যালিমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে"।

সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৩৩

চতুর্থ শর্ত: হলো মেনে নেওয়া:

সম্ভবত কবুল করা ও মেনে নেওয়ার মাঝে পার্থক্য হলো, মেনে নেওয়া হচ্ছে কাজের মাধ্যমে তার অনুসরণ করা। আর কবুল করা হলো, কথা দ্বারা তার সত্যিকার অর্থ প্রকাশ করা। আর দু'টি থেকেই অনুসরণ আবশ্যক হয়। তবে মেনে নেওয়া হলো, আত্মসমর্পন করা ও অনুগত হওয়া এবং আল্লাহর বিধানাবলীর কোন কিছুকে পরিবর্তন না করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফিরে যাও এবং তাঁর জন্য আত্মসমর্পণ করো"।

সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৪

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"তার চেয়ে সুন্দর ধার্মিক আর কে যে নিজকে আল্লাহর সামনে সোপর্দ করলো এবং সে মুহসীন"।

সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২৫

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহর কাছে নিজকে সমর্পণ করে, সে তো শক্ত রশি আকড়েঁ ধরে।

সূরা লুক্বমান, আয়াত: ২২

এটিই হলো আল্লাহর একক ইবাদাতের মাধ্যমে তাঁর অনুগত হওয়া। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সুন্নাত গ্রহণ করে এবং তাঁর আনীত বিধানের অনুসরণ করে ও তাঁর ফায়সালায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর অনুগত হওয়া। যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে উল্লেখ করেন:

অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।

সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫

ফলে তাদের ঈমানের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে শর্ত দিয়েছেন যে, তারা যেন তাঁর ফায়সালাকে মাথা পেতে মেনে নেয়। অর্থাৎ তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছে তার অনুগত হয় এবং তা মেনে নেয়।

পঞ্চম শর্ত: সত্য (সত্যারোপ করা)।

যার বিপরীত মিথ্যা (মিথ্যারোপ করা)।

বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পক্ষ থেকে এ শর্তটি আরোপিত হয়েছে।

"যে ব্যক্তি নিজ অন্তর থেকে সততার সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।

সুতরাং যে তা মুখে বলে এবং অন্তর দিয়ে তার অর্থকে অস্বীকার করে, এ কালিমা তাকে মুক্তি দিবে না। যেমন: আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তারা বললো:

"আমরা সাক্ষ্য দেই যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল"।

সূরা আল-মুনাফিকূন: আয়াত: ১

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

"আর আল্লাহ তা'আলাও জানেন, নিশ্চয়ই আপনি তাঁর রাসূল। তবে আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা নিশ্চিত মিথ্যুক"।

সূরা আল-মুনাফিকূন: আয়াত: ১

এমনিভাবে তিনি তাঁর বাণীতে তাদের মিথ্যারোপ করেন:

“আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি’, অথচ তারা মুমিন নয়”।

সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ৮

ষষ্ঠম শর্ত: ইখলাস:

তার বিপরীত হলো শির্ক

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

“তুমি আল্লাহর ইবাদাত করো তাঁর জন্য আনুগত্যকে খাঁটি করে। জেনে রাখো, খাঁটি আনুগত্য কেবল আল্লাহর জন্য”।

সূরা আয-যুমার, আয়াত: ২-৩

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

“আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যেন আমি আল্লাহর ইবাদাত করি তাঁর জন্য আনুগত্যকে খাঁটি করে”।

সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১১

আর তিনি বলেন:

“আপনি বলুন, আমি আল্লাহর ইবাদাত করি তাঁর জন্য আনুগত্যকে খাঁটি করে”।

সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১৪

বিশুদ্ধ হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

আমার সুপারিশ দ্বারা সেই সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবে যে ব্যক্তি তার অন্তর থেকে একনিষ্ঠভাবে বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই)।

এটিই উতবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীর অর্থ:

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা আগুনের ওপর হারাম করে দিয়েছেন সেই ব্যক্তিকে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”বলে।

অতএব, ইখলাস মানে ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া। এর কোন কিছুই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য ব্যয় করা যাবে না। না নিকটতম কোন ফিরিশতার জন্য, না কোন প্রেরিত নবীর জন্য। তেমনিভাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণে ইখলাস মানে তাঁর সুন্নাত ও ফায়সালার উপর যথেষ্ট করা এবং বিদ‘আত ও বিরোধিতা পরিত্যাগ করা। অনুরূপভাবে মানুষের তৈরিকৃত বিধি-বিধান ও প্রচলনের নিকট বিচারপ্রার্থী না হওয়া। যা তারা শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিকরূপে রচনা করেছে। কারণ, যে এগুলোর উপর সন্তুষ্ট অথবা এগুলো অনুযায়ী ফায়সালা করে সে নিশ্চয়ই একনিষ্ঠ নয়।

সপ্তম শর্ত: ভালোবাসা— যা তার বিপরীত ঘৃণা ও অপছন্দ করা।

তাই বান্দার উপর ওয়াজিব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসা এবং যে কথা ও কাজগুলোকে তিনি পছন্দ করেন সেগুলোকে ভালোবাসা। তেমনিভাবে তাঁর বন্ধু ও অনুগতদেরকে ভালোবাসা। এ ভালোবাসা যখন বিশুদ্ধ হবে তখন এর প্রতিক্রিয়াগুলোও শরীরে প্রকাশ পাবে। তাই আপনি একজন সত্যবাদী বান্দাকে দেখবেন আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করতে। তেমনিভাবে তাঁর আনুগত্য করে মজা পেতে ও তাঁর মাওলার পছন্দনীয় কথা ও কাজগুলোর দিকে দ্রুত ধাবিত হতে। আপনি তাকে দেখবেন পাপগুলো থেকে সতর্ক ও দূরে থাকতে এবং পাপীদেরকে ঘৃণা ও অপছন্দ করতে। যদিও সে পাপগুলো তার মনের পছন্দনীয় ও সাধারণত মজাদার হয়ে থাকে। কারণ, সে জানে জাহান্নামকে মনের চাহিদাসমূহ এবং জান্নাতকে অপছন্দনীয় বস্তুসামগ্রী দিয়ে বেষ্টন করা হয়েছে। যখন পরিস্থিতি এমন হবে তখন সে খাঁটি ভালোবাসার অধিকারী হবে। এ জন্যই যখন

যুন-নূন মিশরীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কখন আমি নিজ প্রতিপালককে ভালোবাসি বলে প্রমাণিত হবে? তিনি বললেন: যখন তাঁর অপছন্দনীয় বস্তু তোমার নিকট ধৈর্যের চেয়ে তিক্ত হবে।

তাদের কেউ বলেন: যে আল্লাহর ভালোবাসার দাবি করে অথচ তাঁর মর্জি মাফিক কাজ করে না, তাহলে তার দাবি বাতিল।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীতে তাঁর ভালোবাসার আলামতের জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণকে শর্ত করেছেন।

"বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

সূরা আলি-ইমরান, আয়াত: ৩১

ইতিপূর্বে আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ভালোবাসার কিছু দলীল ও তার জন্য আবশ্যক কিছু আমলের কথা উল্লেখ করেছি। তেমনিভাবে আল্লাহর ভালোবাসাও।

ষষ্ঠম অধ্যায়:

শাহাদাতাইন বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ:

প্রতিটি মাযহাবে ইসলামের আলেমগণ ফিক্বহের কিতাবসমূহে মুরতাদের বিধানের অধীনে ইসলাম বিধ্বংসী বিষয়সমূহ এবং কিসের মাধ্যমে মুরতাদ হয় সে ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ আবার যে কারণে মানুষ মুরতাদ হয় সেগুলোর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে অতিরঞ্জন করেছেন। আল্লাহর নিকট আমরা আশ্রয় চাচ্ছি। যার সংখ্যা কর্ম ও বর্জনসহ কয়েকশ' পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল-ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ) দশটি বিধ্বংসী বিষয়ে সেগুলোর নির্যাস বলে দিলেন। যা তাওহীদগুচ্ছ ও অন্যান্য বইতে উল্লিখিত হয়েছে।

আমরা এখানে বিশেষ করে এমন কিছু চরিত্রের কথা উল্লেখ করবো যেগুলো করা তাওহীদের কালিমাদ্বয় বিরোধী। যার দরুন এগুলো উচ্চারণ করলে এবং এগুলোর কাজ করলেও কোন সাওয়াব হবে না। সেগুলোর কিয়দংশ নিম্নরূপ:

প্রথমতঃ

দুনিয়ার কিছু বিদ্যমান বস্তুকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন বলে অস্বীকার করা অথবা দুনিয়ার কিছু পরিচালনা ও তসরুফকে প্রকৃতি ও আকস্মিকতার সাথে সম্পৃক্ত করা। কারণ, এটি প্রতিপালকের উপর আঘাতের শামিল এবং এটি এক আল্লাহর জন্য পরিপূর্ণ তসরুফ সাব্যস্ত করা এবং সে জন্য যে তিনি ইবাদাতের একমাত্র উপযুক্ত সে বিষয়ক মুসলিম আক্বীদা বিরোধী।

দ্বিতীয়তঃ

আল্লাহর কিছু পরিপূর্ণ গুণাবলীকে অস্বীকার করা। যেমন: জ্ঞান, জীবন, চিরসংরক্ষণ, পরাক্রমশীলতা, শ্রবণ ও দর্শন। কারণ, এটি হলো চরম অবমাননা। যা একজন প্রতিপালকের ইবাদতের উপযুক্ত হওয়া বিরোধী। তেমনিভাবে এমন কোন ত্রুটিকে সাব্যস্ত করা যা থেকে আল্লাহ নিজকে পবিত্র করেছেন। যেমন: তন্দ্রা, নিদ্রা, ভুলে যাওয়া, যুলম, সন্তান, অংশীদার ইত্যাদি। কারণ, এটি সেই পরিপূর্ণতা বিরোধী যার মাধ্যমে তিনি সকল সৃষ্টির ইবাদাতের উপযুক্ত হয়েছেন।

তৃতীয়তঃ

কোন কোন সৃষ্টিকে স্রষ্টার কতক বিশেষত্বে বিশেষিত করা। যেমন: গাইবের খবর জানা, সার্বিক ক্ষমতা, জগতের মধে পরিপূর্ণ তসরুফ করা এবং আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সৃষ্টি ও তৈরির করার ওপর ক্ষমতা রাখা। কারণ, এটি হলো আল্লাহর সাথে এ সৃষ্টিকে অংশীদার করা এবং সেটিকে স্রষ্টার মর্যাদায় উন্নীত করা। এটি মূলতঃ আল্লাহর জন্য চরম অবমাননা।

চতুর্থতঃ

সব ইবাদাত কিংবা কিছুর উপযুক্ত হওয়াকে রবের জন্য না করা। যেমন: এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা যাবে না ও তাঁকে ডাকা যাবে না। তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়ার তিনি উপযুক্ত নন। অথবা এটির কোন গুরুত্ব নেই কিংবা তাতে কোন ফায়েদা নেই বলে বিশ্বাস করা। অনুরূপভাবে এটি বিধান সেই ব্যক্তিরও যে কিছু কিছু ইবাদাতকে নিয়ে ঠাট্টা করে অথবা মুসল্লীদেরকে নিয়ে বিদ্রূপ করে কিংবা যে কোন আনুগত্যকে আঁকড়ে ধরা ব্যক্তিদেরকে নিয়ে মশকারা করে। কারণ, এটি শরি'আতকে খাট করা। আর তা শাহাদাতাইনের পরিপন্থী।

পঞ্চমতঃ

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, কোন কোন মানুষের বিধান ও নিয়ম তৈরি করার সুযোগ রয়েছে এবং এমন বিধানাবলী রচনা করার যা শরীয়তকে পরিবর্তন করে দেয়। যেমন: ব্যভিচার বা সুদকে জায়িয করা, শরীয়তের কোন শাস্তিকে বাতিল করা। যেমন: হত্যাকারী হত্যা ও চোরের হাত কাটা এবং যাকাতকে পরিবর্তন করা ও ফরয বা যে কোন ইবাদাতকে পরিবর্তন করা। তেমনিভাবে আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া যে কোন বিধানের ফায়সালা গ্রহণ করা এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতিরেকে বিচার করা। যে ব্যক্তি এটি ও এমন কিছু বিশ্বাস করলো সে যেন রবের শরীয়তের উপর প্রশ্ন তুললো। আর সে ধারণা করলো যে, এটি অপূর্ণাঙ্গ ও অসঙ্গতিপূর্ণ অথবা আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যটি তাঁর বিধানের চেয়ে উত্তম। এটি চরম দোষ যা খাঁটি তাওহীদের সাথে একত্র হয় না।

ষষ্ঠতঃ

ইবাদাতের কোন প্রকারকে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সোপর্দ করা। এটিই এ যুগের কবরপূজারীদের শিরক। সুতরাং যে কোন মৃত ব্যক্তিকে ডাকলো অথবা তাকে আশা করলো কিংবা তার অন্তরকে তার সাথে লাগিয়ে রাখলো অথবা তাকে আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় ভালোবাসলো কিংবা তার জন্য ঝুঁকলো অথবা কবর ইত্যাদির পাশে গিয়ে নত ও বিনয়ী হলো কিংবা তার কবর তাওয়াফ করলো বা তার জন্য যবাই করলো অথবা অন্য কোন ইবাদাত করলো তাহলে সে তার সাক্ষ্য : “আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল” বাতিল করে দিলো। ইতিপূর্বে উলূহিয়্যাত ও ইবাদাতের অর্থ সংক্রান্ত এবং তার মধ্যকার কিছু জিনিস নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সপ্তমতঃ

আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা এবং তাদেরকে ভালোবাসা ও কাছে টানা উপরন্তু তাদের মর্যাদা বাড়ানো এবং বিশ্বাস করা যে, তারা সত্যের উপর রয়েছে অথবা তারা মুসলিম অপেক্ষা সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার বেশি হকদার। চাই তারা আহলে কিতাব হোক কিংবা মূর্তিপূজারী অথবা যুগবাদী। কারণ, তাদের আনুগত্য এবং তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া ইঙ্গিত করে যে, নিশ্চয়ই তারা সত্যের উপর রয়েছে এবং তাদের বিপরীত মুসলিমরা পথভ্রষ্ট ও ভুলে আছে অথবা তাদেরকে সম্মান করা তাদের দুনিয়া ও দুনিয়াবী জ্ঞানকে সম্মান করা প্রমাণ করে। আর এ সবই সাক্ষ্যের মূল প্রেরণা বিরোধী।

অষ্টমতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রিসালাত অথবা তাঁর শরীয়তে ছিন্দান্বেষণ করা কিংবা তাঁকে মিথ্যারোপ করা অথবা তাঁর খিয়ানত বা তাঁর প্রতি নাযিলকৃত ওহী লুকানোর দাবি করা। তেমনিভাবে তাঁকে প্রকাশ্যে গালি দেয়া বা তাঁর দোষ ধরা কিংবা তাঁর জীবনী, তাঁর আমল, তাঁর অবস্থা বা তাঁর কোন কর্মকে নিয়ে ঠাট্টা করা এবং এরূপ কিছু করা যা ভেতর থেকে তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করার প্রমাণ বহন করে। কারণ, তাঁর ভেতর ছিদ্রান্বেষণ মানে তাঁর রবের ছিদ্রান্বেষণ। যেহেতু তিনিই তাঁকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে এ রিসালাত বহনকারী বানিয়েছেন। আর এটি শাহাদাতাইনের বাক্যের বিরোধীও বটে।

নবম:

কুর'আনের ছিদ্রান্বেষণ করা যা আল্লাহর বাণী। যেমন: মুশরিকদের দাবি করা যে, নিশ্চয় কুর'আন যাদু কিংবা কবিতা অথবা পূর্ববর্তীদের কাহিনী মাত্র বা তা মিথ্যা বানোয়াট। তেমনিভাবে যে ধারণা করে যে, এটি মানুষের কথা অথবা তার মুজিযা হওয়াকে অস্বীকার করে বা এর ন্যায় কিছু এনে এর বিরোধিতা করার চেষ্টা করে কিংবা এটি করা সম্ভব বলে মনে করে অথবা এর কিছু সূরা বা মুতাওয়াতির আয়াতকে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপকারী। আর এটি তাওহীদের কালিমা পরিপন্থী।

দশমতঃ গায়েবের কোন কিছুকে অস্বীকার করা যার প্রতি ঈমান আনতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন এবং তা প্রমাণিত ও সত্য বলে নিজ কিতাবে ও তাঁর রাসূলের মুখে সংবাদ দিয়েছেন। যেমন: ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ,

রাসূলগণ, মৃত্যুর পরের পুনরুত্থান, শরীরগুলোকে একত্রিত করা, জান্নাত ও জাহান্নাম। তেমনিভাবে কবরের আযাব ও শাস্তি ইত্যাদি। কেউ যদি এগুলোর কোন কিছুকে অস্বীকার করে সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যাবাদী বানালো। এটি রিসালাত ও রিসালাতের অধীন বিষয়ের প্রতি বিরাট আঘাত এবং শাহাদাতাইনের আবশ্যকীয় বিষয়ের বিরোধীও বটে।

আমি শাহাদাতাইন সম্পর্কীয় এবং যার মাধ্যমে এগুলোর বাস্তবায়ত সম্ভব সে জাতীয় এতটুকু কথা বলে ক্ষান্ত হচ্ছি। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে চায় সে তা দা'ওয়াতে ইমামগণের কিতাবসমূহে পেয়ে যাবে। তেমনিভাবে সে তা তাঁদের পূর্ববর্তী মুসলিম আলিমদের কিতাবেও পেয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞানী ও হিকমতপূর্ণ।মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাথীদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

দু'টি সাক্ষী (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) এর অর্থ ও তাদের প্রত্যেকের জরুরী বিষয়। 1
ভূমিকা: 1
প্রথম অধ্যায় : দুটি সাক্ষীর ফযীলত সম্পর্কে। 1
দ্বিতীয় অধ্যায় : দু'টি সাক্ষীর ওপর জিহাদ করা ও সাক্ষী দু'টি বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব। 3
তৃতীয় অধ্যায় : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমার অর্থ প্রসঙ্গে: 4
চতুর্থ অধ্যায়: (মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল) সাক্ষীর অর্থ সম্পর্কে। 9